ছোটদের আরব্য রজনীর সেরা গল্প

আমীরুল ইসলাম
আহমাদ মাযহার

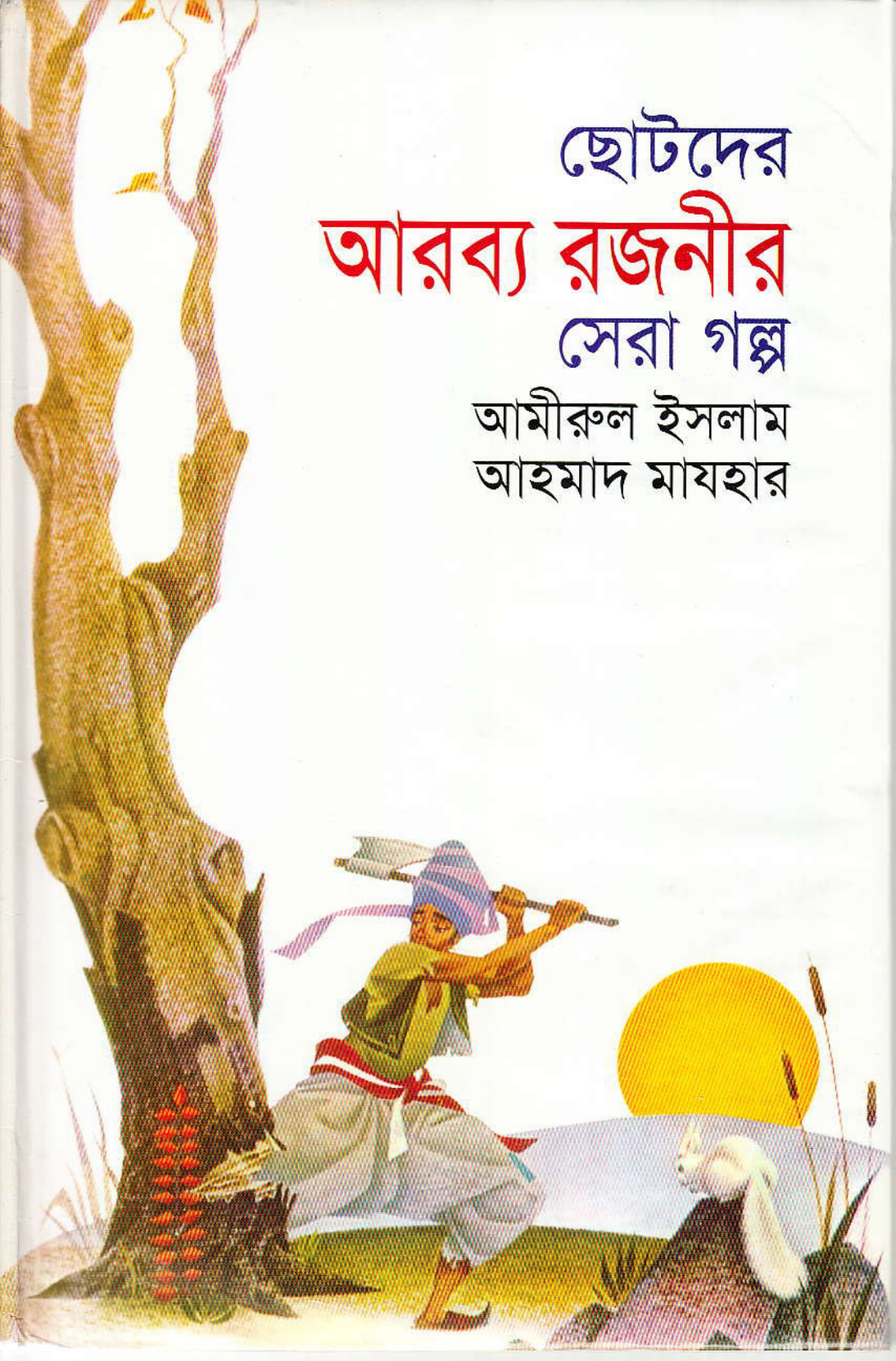

চিরায়ত গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

ছোটদের
আরব্য রজনীর
সেরা গল্প

আমীরুল ইসলাম
আহমাদ মাযহার
পুনর্কথিত

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
আলোকিত মানুষ চাই
অন্তর্ভুক্তি নং
৭৫১৯০
স্থাপিত-১৯৭৮
বইটিকে যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করুন

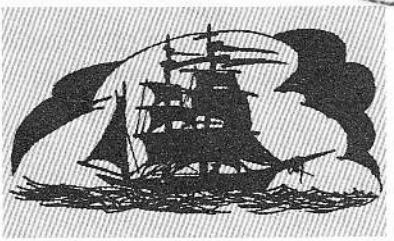

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২৯৮

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
মাঘ ১৪১২ জানুয়ারি ২০০৬

চতুর্থ সংস্করণ সপ্তম মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অলঙ্করণ
সৈয়দ এনায়েত হোসেন

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0297-10

উৎসর্গ

যারা গল্প শুনতে ভালোবাস
যারা গল্প বলতে ভালোবাস

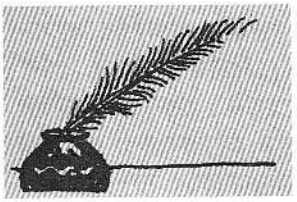

গল্প পড়ার আগে

'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা' কথাটার অর্থ এক হাজার এক রাত্রি। এক হাজার এক রাত্রি জুড়ে থাকা দুশো চৌষট্টিটি গল্প 'আরব্য রজনী' নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। গল্পটি গড়ে উঠেছে এক বুদ্ধিমতী মেয়েকে কেন্দ্র করে। নারীকে চরম ঘৃণা করে এমন এক সুলতান তার স্বামী। প্রতি রাত্রে একটি মেয়েকে সে বিয়ে করে এবং পরদিন তাকে হত্যা করে। বুদ্ধিমতী সেই মেয়ে নববধূটি এই রকম এক বাতিকগ্রস্ত সুলতানকে ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি গল্প বলে হাজার রাত পার করে দিয়েছে। সুলতান আর তাকে হত্যা করতে পারেনি তার গল্পের মোহে পড়ে। শাহরাজাদ নামের সেই মেয়েটির হাজার রাত ধরে বলা এই গল্পগুলোই 'আরব্য রজনীর গল্প'। আরবি লোককথার অবিস্মরণীয় এই সংগ্রহের গল্পগুলো ফিরতো মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান কথকদের মুখে মুখে। বিচিত্র মানুষের মনের মাধুরি মেশানো এই গল্পগুলো এভাবেই ফুলে-ফেঁপে উঠেছে ধীরে ধীরে। এক সময় তা পৌঁছে গেছে পাশ্চাত্যে। এর অনেকগুলোর উৎস ভারতবর্ষে। কিন্তু আরবি কথকদের মনের কল্পনায় রঙিন হয়ে তা লাভ করেছে নতুন রূপ। পাশ্চাত্যের হাত ঘুরে তা আবার ফিরে এসেছে ভারতবর্ষেই। ভারত-আরব-ইয়োরোপব্যাপী বিস্তৃত এই গল্পগুলো একদিন হয়ে উঠেছে সকলের প্রিয়, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসেবে পেয়েছে মর্যাদার আসন।

আরব্য রজনীর গল্পগুলো আজ যে-রূপে আমরা পাই তা গড়ে উঠেছে ইয়োরোপীয়দের হাতে। আঁতোয়া গালাঁ [Antoine Gallandl (১৬৪৬-১৭১৫) নামে এক ফরাসির অনুবাদের মাধ্যমে এই আরব লোককথা ইয়োরোপবাসীর হাতে গিয়ে পড়ে। গালাঁর এই অনুবাদ নিয়ে অবশ্য অনেক বিতর্ক আছে। কারণ গালাঁ এই গল্পগুলো অনুবাদের সময় মূল-এর পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। অনেক ক্ষেত্রেই রূপান্তর করেছেন স্বাধীনভাবে। তা সত্ত্বেও আরব্য রজনীর গল্পগুলোর দ্বারা উজ্জীবিত হয়েছিলেন ভলতেয়ার-এর মতো মনীষী। গালাঁর পরে অনুবাদে এগিয়ে আসেন এডোয়ার্ড উইলিয়াম লেন। ১৮৩৯ থেকে ১৮৪১ সালের মধ্যে তিনি

প্রকাশ করেন আরব্য রজনীর গল্পের এক নির্ভরযোগ্য সংস্করণ। তারপর আসেন ভাষাবিদ, পর্যটক, রিচার্ড বার্টন (১৮২১-১৮৯০)। রিচার্ড বার্টনের লেখা বৃহদায়তন এই বইটি কিন্তু ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়েছিল ভারতবর্ষের কাশী থেকে। এরপরে আর এক ফরাসি অনুবাদকের রূপান্তরে বিখ্যাত হয় আরব্য রজনী। পেশায় চিকিৎসক সে অনুবাদকের নাম জোসেফ চার্লস মারদ্রুস [Joseph Charls mardrus] (১৮?-১৯৪৯)। মারদ্রুসের অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে। ১৯৮২ সালে ক্ষিতীশ সরকার ডা. মারদ্রুসের সংস্করণেরই বাংলা অনুবাদ করেন। এটিই বাংলা ভাষায় আরব্য রজনীর পূর্ণাঙ্গতম অনুবাদ। জার্মান ভাষা ও স্পেনীয় ভাষাতেও আরব্য রজনী পৌঁছে গিয়েছিল উনিশ শতকের শেষ বা বিশ শতকের প্রথম ভাগেই।

আরব্য রজনীর গল্পগুলোতে যেভাবে ঘটনাবিন্যাস ঘটেছে তা খুবই চিত্তাকর্ষক। ঘটনাগুলো আকস্মিকতা ও নাটকীয়তায় ভরা। আছে নীতিকথা। গল্পগুলোর মধ্যে ইসলামপূর্ব যুগের আরবের মানুষের সমাজজীবনের পরিচয় যেমন আছে তেমনি আছে ইসলাম-উত্তর যুগের বৈশ্বিক জীবন-চেতনা। পরিণত মনের মানুষের কথা যেমন আছে তেমনি আছে শিশু-কিশোরদের কল্পনাকে রাঙিয়ে দিতে পারে এমন কথা। আধুনিক যুগের লেখকেরা ছোটদের কাছে কতভাবে যে পরিবেশন করেছেন এই গল্পগুলো তার কোনও লেখাজোখা নেই। বাংলা ভাষায় দুইশোরও বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে আরব্য রজনীর গল্প নিয়ে; আর এর মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগই ছোটদের উপযোগী। এই বইটি ঐ তালিকায় আরও একটি নাম যোগ করল।

আরব্য রজনীর গল্পগুলো ছোটদের কথা ভেবে রচনা করা হয়নি। কিন্তু কল্পনার জগৎ তো ছোটদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সেই জগতের কথা যেহেতু আরব্য রজনীর গল্পগুলোতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে সেহেতু তার থেকে ছোটদের উপযোগী বিশ্বব্যাপী পরিচিত কয়েকটি গল্প এখানে অন্তর্ভুক্ত হল। তবে আমরা আশা করব আজকে যারা ছোট তারা বড় হয়ে পূর্ণাঙ্গ আরব্য রজনীর স্বাদ গ্রহণ করবে।

বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে। নতুনভাবে এবারে প্রকাশ করছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। প্রথম সংস্করণে সৈয়দ এনায়েত হোসেন সুন্দর অলঙ্করণ করে দিয়েছিলেন। সেই অলঙ্করণগুলোই এখানে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হল। উল্লেখ্য যে, সেই ১৯৯০ সালে বইটি রচিত হয়েছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের স্কুল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের কথা মনে করে।

আমীরুল ইসলাম
আহমাদ মাযহার

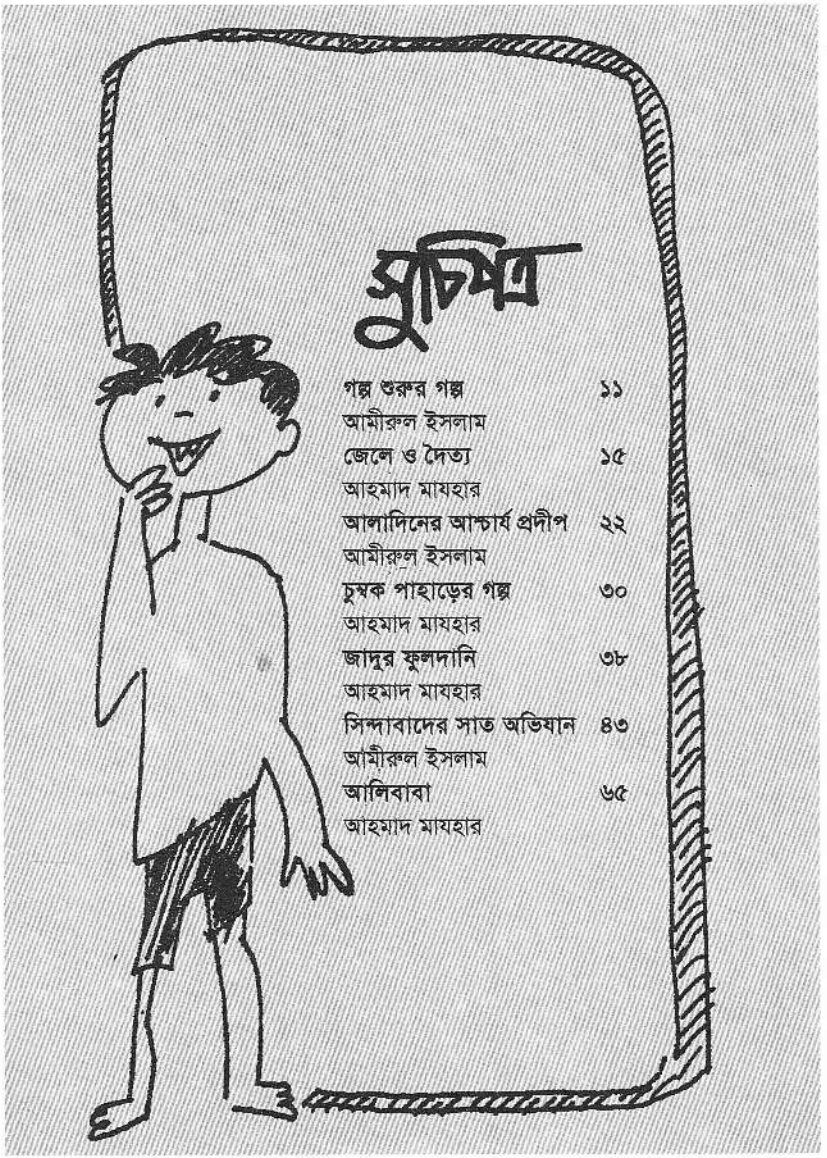

সূচিপত্র

গল্প গুরুর গল্প ১১
আমীরুল ইসলাম

জেলে ও দৈত্য ১৫
আহমাদ মাযহার

আলাদিনের আশ্চার্য প্রদীপ ২২
আমীরুল ইসলাম

চুম্বক পাহাড়ের গল্প ৩০
আহমাদ মাযহার

জাদুর ফুলদানি ৩৮
আহমাদ মাযহার

সিন্দাবাদের সাত অভিযান ৪৩
আমীরুল ইসলাম

আলিবাবা ৬৫
আহমাদ মাযহার

গল্প শুরুর গল্প

ইরান দেশের বাদশাহ শাহরিয়ার।

প্রজাদের ভারি ভালোবাসেন। যেমন বড় হৃদয়, তেমনি তাঁর প্রতাপ। রাজার সুশাসনে রাজ্যে অপার শান্তি। কিন্তু একটি ঘটনা হঠাৎ বাদশাহ শাহরিয়ারকে এলোমেলো করে দিল। মনটা ভেঙে তাঁর কাচের মতো টুকরো টুকরো হয়ে গেল। প্রিয়জনের কাছ থেকে পেয়েছেন তিনি বিশ্বাসঘাতকতা! প্রিয়তমা বেগম তাঁকে করেছে প্রতারণা। এ তিনি কী করে সহ্য করবেন? যাকে তিনি বিশ্বাস করেন হৃদয় দিয়ে সেই কি-না তাঁর হৃদয়টাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে?

বাদশাহর সামনে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে এল। দয়ালু বাদশাহ হয়ে উঠলেন নিষ্ঠুর। বেগমকে তিনি হত্যা করলেন বিশ্বাসহীনতার জন্যে। তারপর তাঁর মন থেকেও শান্তি গেল পালিয়ে। কাকে তিনি বেগম বানাবেন? কাউকে যে বিশ্বাস করা যায় না!

উজিরকে ডেকে তিনি বললেন, রোজ রাতে একজন করে মেয়েকে তিনি বিয়ে করবেন। আমির-ওমরাহদের ঘর থেকে একজন করে সুন্দরী মেয়ে জোগাড় করে আনতে হবে প্রতিদিন। ধুমধাম করে, জাঁক-জমকের সাথে বিয়ে হবে। কিন্তু সে থাকবে একরাতের বেগম। পরদিন সকালেই তার মৃত্যু!

দিন যায়। মাস যায়। এভাবে বছরও কেটে যায়। দেশে সুন্দরী মেয়ে আর পাওয়া যায় না।

চিন্তায় চিন্তায় উজিরের তখন মাথা খারাপ। মনমরাভাবে সারাদিন বাড়িতে বসে থাকেন তিনি। খালি হাতে বাদশাহর কাছে গেলে উজিরের গর্দান যাবে। কিন্তু কী করবেন উজির?

www.alorpathsala.org

উজিরের ছিল দুই মেয়ে। দুজনই পরমা সুন্দরী। রূপের চেয়ে গুণ তাদের বেশি। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে দুজনেই অতুলনীয়। বড় মেয়ের নাম শাহরাজাদ। ছোটর নাম দুনিয়াজাদ। শাহরাজাদ জানে ইতিহাসের গল্প। জানে সুললিত কণ্ঠে গান গাইতে। জানে নানাদেশের গল্প-কাহিনী, রূপকথা।

বাবাকে চিন্তিত দেখে শাহরাজাদ বলল,

'কী এত চিন্তা কর আব্বাজান? কী হয়েছে তোমার? বিপদ আপদ ঘটেনি তো কোনও? তুমিই তো বাবা আমায় বলেছ কোনও কিছুর জন্যে শোকে-দুঃখে কাতর হয়ে ভেঙে পড়া উচিত নয়। সুখ চিরদিন থাকে না। দুঃখও তেমন চিরস্থায়ী নয়।'

মেয়ের কথা শুনে বাবার ভারি ভালো লাগল। বাদশাহ শাহরিয়ারের কাহিনী সবিস্তারে কন্যাকে বলল উজির। শাহরাজাদ জানাল,

'বাবা আজই আমার শাদি মোবারক দিয়ে দাও বাদশাহর সাথে। দেখি আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব কি-না? শুধু বাদশাহ যেন জানতে না পারেন আমি উজিরের মেয়ে।'

শাহরাজাদ আরও বলল,

'বাবা, আমি যদি ফিরতেও না পারি তবু আফসোস রেখ না। কারণ আমি বাদশাহকে উপযুক্ত শিক্ষাই দিয়ে আসব।'

বিয়ে হয়ে গেল বাদশাহর সঙ্গে শাহরাজাদের। শাহরাজাদও হল একরাতের বেগম। বাসরঘরে প্রবেশের আগে শাহরাজাদ বলল তার বোনকে,

দুনিয়াজাদ, আমি তো তোদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমি যখন বাদশাহর ঘরে ঢুকব তখন একবার আমি তোকে ডেকে পাঠাব। তুই এসে আমার কাছে আবদার ধরবি, 'আপা—গল্পটার শেষটা শোনাবে না আজকে। তুমি-না প্রতিরাতেই একটা করে গল্প শুনিয়ে আমাকে ঘুম পাড়াও! আজ আমি কী করে ঘুমাব? আর তো আমি তোমার সুন্দর সুন্দর গল্প শুনতে পারব না—'

সব ব্যবস্থা পাকা হল। বিয়ের পোশাকে অপরূপ দেখাচ্ছে শাহরাজাদকে। বাদশাহ শাহরিয়ারের খাস মহলের কামরায় গেল সে। কিন্তু বাদশাহ তাকিয়েও দেখল না বেগমকে। বেগম এমন সময় কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে।

'কাঁদছ কেন বেগম? ভয় কী? কী চাই তোমার?'

'আমার ছোটবোনের জন্য মন কাঁদছে। একসঙ্গে আমাদের দিন কাটত। আমাকে ছাড়া সে থাকবে কীভাবে?'

বলেই শাহরাজাদ হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

বাদশাহ দুনিয়াজাদকে নিয়ে আসার জন্য হুকুম দিল প্রহরীদের।

দুনিয়াজাদ এসেই শিশুর মতো শাহরাজাদের গলা পেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল। যেন কতদিন পর দেখা মিলেছে ওদের। দুনিয়াজাদ তখন আবদার ধরল—

'আপা, তুমি এবার গল্প শোনাও। ঐ সুন্দর গল্পগুলোই আমি শুনতে চাই। যে তোমার গল্প একবার শুনবে সে কখনও ভুলতে পারবে না। আজ তুমি গল্প শোনাবে না আমাকে? তোমার গল্প না শুনলে যে আমার ঘুম আসে না।'

শাহরাজাদ কাঁদো কাঁদোভাবে জানাল,

'আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে বোন। আমার স্বামী বাদশাহর হুকুম ছাড়া আমি কিছু করতে পারব না আর।'

দুই বোনের গল্প শুনে মজাই পেলেন বাদশাহ।

'ঠিক আছে। শোনাও দেখি তোমার গল্প। আমিও শুনতে চাই।'

এই রকম একটি সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল শাহরাজাদ। বাদশাহর অনুমতি পেয়ে সে শুরু করল আশ্চর্য সুন্দর সব গল্প। গল্প শুনতে শুনতে রাত শেষ হয়ে যায়। কিন্তু গল্প শেষ হয় না কোনওদিন।

শাহরিয়ার বলেন, আজ আমি ঘুমুব। কাল আবার শুনব বাকিটুকু।

রাতের পর রাত চলতে লাগল গল্প বলার পালা। অদ্ভুত, আশ্চর্য, চমকপ্রদ সেইসব গল্প কাহিনী শুনতে শুনতে বাদশাহ শাহরিয়ার বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন। শাহরাজাদের গর্দান আর নেয়াই হল না।

শাহরাজাদও বাঁচল। দেশের মেয়েরাও বাঁচল।

নতুন করে সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে লাগলেন ইরানের বাদশা শাহরিয়ার। শাহরাজাদ গল্প শুনিয়েছিল এক হাজার এক রাত্রি ধরে। সেই গল্পগুলোই হচ্ছে আরব্য রজনীর গল্প। এর নাম আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা—অর্থাৎ এক হাজার এক রজনীর গল্প।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

জেলে ও দৈত্য

এক দেশে বাস করত এক জেলে। তার বাড়ি ছিল এক নদীর ধারে। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে কোনওরকমে কেটে যেত তার দিন। তার নিয়ম ছিল—দিনে পাঁচবারের বেশি জাল ফেলত না।

একদিন।

দুপুরবেলা সে গেছে জাল ফেলে মাছ ধরতে। প্রথমবার খুব ভারি কী যেন একটা আটকে গেল জালে। জেলে ভাবল না-জানি কত বড় মাছ উঠেছে।

কিন্তু জালটা তুলতেই জেলে অবাক! বড়সড় একটা গাছের গুঁড়ি আটকে আছে জালে। দ্বিতীয়বার জাল ফেলল জেলেটা। এবারও ভাগ্য খারাপ। এবার উঠেছে একটা মরা গাধা! মনটা খারাপ হয়ে গেল জেলের। তৃতীয়বার উঠল একটা কাদা-ভর্তি মাটির কলস। এবার জেলের মনে হল আল্লাহ বোধ হয় তাকে স্ত্রী-পুত্রসহ না খাইয়ে মারতে চান। চতুর্থবার জালে উঠল কয়েকটা ভাঙা বাসন-কোসন। মনের দুঃখে হতাশ হয়ে জেলে শেষবারের মতো জাল ফেলল।

এবার উঠল একটা বেশ বড় আকারের তামার কলস। তুলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল জেলের। ভীষণ ভারি তামার কলসটা! টেনেটুনে পাড়ে এনে তুলল কোনওরকমে। জেলে ভাবল মাছ না পেলেও এই কলস বেচে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। এমনকি সে রোজ যে পরিমাণ মাছ ধরে কলসটার দাম তারচেয়ে বেশিও হয়ে যেতে পারে।

কলসটাকে উল্টে-পাল্টে দেখল জেলে। কলসের মুখ খুব শক্তভাবে আটকানো। ঢাকনার মধ্যে একটা সিলমোহর। তাতে সুলেমান বাদশাহর নাম খোদাই করা। জেলে ভাবল কলসের ভেতর অনেক মোহর বা সোনাদানা থাকতে পারে। তাই অনেক কষ্টে খুলে ফেলল ঢাকনাটা।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটল এক অবাক কাণ্ড!

কলসের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ধোঁয়ার কুণ্ডলি। সেই ধোঁয়া বেরুতে বেরুতে আকাশ প্রায় ঢেকে ফেলার অবস্থা! কিছুক্ষণ যেতেই সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলিটা পাক খেতে খেতে রূপ নিল এক বিশাল দৈত্যের। জেলে তো কাঁপতে লাগল ভয়ে! ভয় হবে না কেন! দৈত্যটার দুই চোখ থেকে যেন আগুন বেরুচ্ছে। গোঁফ দুটো ইয়া মোটা আর পাকানো। দাঁতগুলো যেন বিরাট পাথরের টুকরো। হাতদুটো যা বিরাট! জেলেকে ধরে যদি ছুড়ে মারে তাহলে ছোট্ট একটা ঢিলের মতো কতদূরে গিয়ে যে পড়বে তার ঠিক নেই।

জেলেকে দেখে বলে উঠল ভয়ঙ্কর দৈত্যটা,

'আমাকে এবার ছেড়ে দাও সুলেমান পয়গম্বর। আমি আর কখনও তোমার অবাধ্য হব না। তোমার অবাধ্য হয়েছিলাম বলে আল্লাহর নির্দেশে তুমি আমাকে এই কঠিন শাস্তি দিয়েছিলে। আর কখনও তোমার অবাধ্য হব না! দয়া করে এবারের মতো মাফ করে দাও।'

'আমি তো সুলেমান পয়গম্বর নই দৈত্যসম্রাট। আমি এক সামান্য জেলে।' কাঁপতে কাঁপতে সত্যি কথাটাই বলল জেলে।

'তাহলে তো ভালোই হল। তোমাকে আমার হাতে মরতে হবে।' যেন মহা খুশি হয়ে উঠল দৈত্যটা। আর জেলের অবস্থা যে কী হল তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তবু সাহস হারাল না জেলেটা। বিপদে সাহস হারাতে নেই। সাহস থাকলে বাঁচার অনেক উপায় আসতে পারে মনে। সাহস করে দৈত্যকে জিজ্ঞাসা করল জেলে,

'আমি তোমাকে মুক্তি দিয়েছি। আর তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চাও! আমি তো উপকার করেছি তোমার। উপকারীকে কি খুন করা উচিত কারও?'

তখন দৈত্যটা তার নিজের জীবনের গল্প বলতে শুরু করল।

'আমি ছিলাম সুলেমান পয়গম্বরের হুকুমের দাস। আমার অনেক শক্তি। কীভাবে যেন আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি এল একদিন। আমি সুলেমান পয়গম্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসলাম। কিন্তু তিনি তো আল্লাহর নবী। সত্যের শক্তি আছে তাঁর। খুব সহজেই পরাজিত হলাম আমি। আমাকে ধরে এই কলসের মধ্যে পুরে ফেললেন তিনি। তারপর খুব শক্ত করে মুখটা এঁটে নদীতে ফেলে দিলেন। তারপর কত বছর কেটে গেল! আমি এই কলসেই বন্দি হয়ে রইলাম। কী যে কষ্ট হয়েছে আমার! প্রথম একশো বছর শুধু ভাবতাম যদি কেউ আমাকে মুক্ত করে দেয় তাহলে তাকে অনেক ধনী বানিয়ে দেব। পৃথিবীর সেরা ধনী হবে সে। কিন্তু কই? একশো বছরের মধ্যে কেউ তো মুক্ত করল না আমাকে। তারপর ভাবলাম, এবার যদি কেউ মুক্ত করে আমাকে তাহলে তাকে অনেক হিরে-জহরৎ ও মুক্তো-মানিক দেব। এভাবে কেটে গেল আরও একশো বছর। কিন্তু কই?

কেউ তো এল না আমাকে এই কলস থেকে মুক্ত করতে? তারপর আমি শপথ করলাম, এবার যদি কেউ আমাকে মুক্ত করে তাহলে তাকে মেরে ফেলব। সেজন্য তোমাকে মরতে হবে এখন।'

জেলে দেখল, এ তো ভারি বিপদ! এই মোটাবুদ্ধির দৈত্য তো তাকে সত্যি সত্যি মেরে ফেলবে! অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল দৈত্যটাকে তাকে যেন হত্যা না করে। কিন্তু দৈত্যটা নাছোড়বান্দা। মেরে তাকে ফেলবেই। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বুদ্ধি আর সাহস হারাল না জেলে। এ-কথা সে-কথা বলে কিছুক্ষণ সময় নষ্ট করল। হঠাৎ জেলের মাথায় বুদ্ধি এল একটা।

'আচ্ছা তুমি তো বিরাট দৈত্য। তুমি এই কলসটার মধ্যে কীভাবে থেকেছ? আমার তো মনে হয় এই কলসে তোমার একটা ঠ্যাঙও ঢুকবে না। এত বড় দেহ নিয়ে এর মধ্যে ঢোকা সম্ভবই না। নিশ্চয়ই গুল মেরেছ তুমি।'

খেপে গেল দৈত্যটা।

'কী, এত বড় অপবাদ! আমি মিথ্যেবাদী? দেখ তাহলে। আবার এর মধ্যে ঢুকে দেখাচ্ছি তোমাকে ঢুকতে পারি কি-না।'

জেলেও তা-ই চাইছিল।

সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যটা এতটুকু হয়ে সুড়সুড় করে ঢুকে পড়ল। যেই-না দৈত্যটা পুরোপুরি কলসের মধ্যে ঢুকেছে অমনি জেলে ঢাকনা বন্ধ করে দিল কলসের। ঢাকনা বন্ধ হবার পর ব্যাপার বুঝতে পারল দৈত্য। আর শুরু হল তার দাপাদাপি। কিন্তু সুলেমান পয়গম্বরের সিলমোহর আঁকা ঢাকনা। এটা খোলা তো আর তার পক্ষে সম্ভব নয়!

দৈত্যের দাপাদাপি চলতে লাগল। জেলের কাছে মিনতি করতে লাগল সে,

'আমাকে মুক্ত করে দাও। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি আমার উপকার করেছ। তোমার কি আমি ক্ষতি করতে পারি? দয়া করে ছেড়ে দাও আমাকে।'

এবার আর জেলের মন গলছে না তার কথায়।

'আর তোমাকে ছাড়ছি না। তোমার এই কলসের মধ্যে বন্দি থাকাই ভালো। আমি আবার তোমাকে নদীতে ফেলে দিচ্ছি।'

'দোহাই তোমার। এবারের মতো মাফ করে দাও জেলে ভাই।'

'আর ভুল হবে না। তোমাকে কিছুতেই আর মুক্ত করব না। বাদশাহ উনান আর হেকিম রায়ানের গল্পটা জানা আছে আমার। একবার ছেড়ে দিয়ে যে বিপদে পড়েছি আর সে ভুল কিছুতেই হবে না। উফ্ ভুলে গিয়েছিলাম গল্পটার কথা।'

'বাদশাহ উনান আর হেকিম রায়ানের গল্প আমি তো কখনও শুনিনি!'

'শোনো তাহলে।'

জেলে শুরু করল সেই গল্প।

অনেককাল আগে রুম দেশে রাজত্ব করতেন উনান। তাঁর ছিল কুষ্ঠ রোগ। দেশ-বিদেশের কোনও চিকিৎসক-হেকিমই তাঁর কুষ্ঠ সারাতে পারল না। বাদশাহ উনানের খুব মন খারাপ। তখন এক বুড়ো হেকিম এল তাঁর দরবারে। জানাল বাদশাহর দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগ সারিয়ে তুলতে পারবে সে। নাম তার রায়ান।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন বাদশাহ। মনে তাঁর আর কোনও আশা নেই। তবু বললেন, দেখ চেষ্টা করে। কেউ তো পারল না এই রোগ সারাতে। যদি সারাতে পার আমার এ রোগ তাহলে তোমাকে এত ধন-দওলত দেব যে তোমার নাতি-নাতনিরাও সুখে থাকতে পারবে।

হেকিম রায়ান ছিলেন জ্ঞানী মানুষ। বাদশাহর কথা শুনে তেমন কিছু বললেন না তিনি। কাজ শেষ না করে কোনও ভালোমানুষ বড়াই করে না। হেকিম রায়ান ছিলেন তেমন একজন ভালোমানুষ। চুপচাপ ঘরে এলেন, বইপত্র ঘেঁটে নানান দেশের গাছ-গাছড়া নিয়ে গবেষণা করলেন। তারপর ওষুধ বানালেন হেকিম রায়ান। ভারি আশ্চর্য সে ওষুধ। একটা ফাঁপা লাঠির মধ্যে সেই ওষুধের গুঁড়ো ভরলেন তিনি।

পরদিন এই লাঠি আর বল নিয়ে গেলেন বাদশাহর কাছে। বাদশাহকে বললেন এই লাঠি দিয়ে রোজ বল খেলতে। তাহলেই বাদশাহর কুষ্ঠ চলে যাবে।

সভাসদরা হেকিম রায়ানের এই চিকিৎসার কথা শুনে একজন আর একজনের চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারা পাত্তাই দিল না হেকিমের কথাকে।

কিন্তু বাদশাহ ভাবলেন দেখাই যাক-না চেষ্টা করে। যদি এতে রোগ ভালো হয়ে যায়! হেকিমের কথামতো বাদশাহ রোজ লাঠি দিয়ে বল খেলতে লাগলেন। কুষ্ঠও ভালো হয়ে এল বাদশাহর। একদিন বাদশাহ দেখলেন কুষ্ঠ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছে তাঁর।

কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল বাদশাহ উনানের মন। হেকিম রায়ানকে ধন-দওলত, সোনা-দানা, মণি-মাণিক্য দিয়ে মহা ধনী বানিয়ে ফেললেন। হেকিম হলেন বাদশাহর প্রাণপ্রিয় বন্ধু।

কিন্তু এতে অন্য সভাসদদের মনে অশান্তি সৃষ্টি হল। তারা সবাই এত বছর ধরে বাদশাহর সেবা করে চলেছে। কিন্তু তাদের কোনও কদর নেই। আর কি-না এই নতুন হেকিমের এত আদর! হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল তারা। এমনই হয়। অযোগ্য মানুষেরা চিরকাল এভাবে যোগ্য মানুষদের হিংসে করে। ক্ষতি করতে চায় তাদের। কিন্তু যোগ্য মানুষেরা হিংসুটেদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে কোনো খোঁজও রাখে না।

হেকিম রায়ানও রাখেননি। এদিকে সভাসদরা রোজ বাদশাহর কানে মিথ্যে কথার বিষ ঢালতেই থাকল। তারা বলল, হেকিম রায়ান নাকি জাদুকর। তিনি নাকি জাদু করে বাদশাহর কুষ্ঠ ভালো করে দিয়ে বাদশাহর বন্ধু হবার ভান করছেন। আসলে নাকি তিনি বাদশাহকে হত্যা করার ফন্দি এঁটেছেন। বাদশাহ প্রথমে বিশ্বাস করেননি। কিন্তু সব সভাসদ মিলে এমনই ষড়যন্ত্র করল যে শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ্বাসই করে বসলেন। হুকুম হল বাদশাহকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের অপরাধে হেকিমের মৃত্যুদণ্ড হবে। হেকিম রায়ান অবাক হলেন রাজার আচরণ দেখে। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না প্রথমে। মানুষ যে এমন অকৃতজ্ঞ হতে পারে তা তাঁর কল্পনাতেও আসেনি।

মৃত্যুদণ্ড দেয়ার আগে বাদশাহর কাছে কিছু সময় চাইলেন রায়ান। বললেন, তাঁর বাড়ির জিনিশপত্র গোছগাছের জন্য যেন সময় দেয়া হয় কিছুটা। তাঁর কাছে একটা হেকিমি বই আছ। ওটা হাতের কাছে রাখলে যে কোনও রোগ থেকে বাদশাহ নিজেই চিকিৎসা করে রোগমুক্ত হতে পারবেন। বাদশাহ সময় দিলেন হেকিম রায়ানকে। বইটা পেতে চাইলেন তিনি।

হেকিম রায়ান বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন প্রাসাদে। সৈন্যরা পাহারা দিয়ে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গেল; আবার ফিরিয়েও আনল। হেকিম ফিরে আসতেই বাদশাহ বইটা পেতে চাইলেন। হেকিমের হাতে একটা বড় থালা আর একটা ছোট্ট বোতলে কিসের যেন খানিকটা গুঁড়ো ভর্তি রয়েছে। হেকিম বোতল থেকে গুঁড়ো বের করে থালায় ছড়িয়ে দিলেন,

'মহামান্য বাদশাহ' আমার কাটা মুণ্ডুটা এই থালার উপর রাখলে আমার মুণ্ড থেকে রক্তপড়া বন্ধ হবে। বইটা হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকবেন। তখন দেখবেন আমার কাটা মুণ্ডও কথা বলে উঠবে। কিন্তু মহামান্য বাদশাহ, আমাকে হত্যা করার আগে কিছুতেই আপনি বইয়ের পাতা ওল্টাবেন না।

কিন্তু বাদশাহর তর সইল না যেন। সঙ্গে সঙ্গে পাতা ওল্টাতে গেলেন। পাতার সঙ্গে পাতা জড়িয়ে আছে। পাতা ওল্টাবার জন্য জিভে আঙুল লাগিয়ে আঙুলটা ভিজিয়ে নিলেন। একটার পর একটা পাতা ওল্টালেন। দেখলেন সবগুলো পাতাই শাদা। একইভাবে জিভে আঙুল ভিজিয়ে আরও কটা পাতা ওল্টালেন বাদশাহ। কিন্তু একই অবস্থা। জিজ্ঞাসা করলেন রায়ানকে,

'কই, লেখা কই? সব পৃষ্ঠাই তো শাদা।'

'পাতা উল্টে যান মহামান্য বাদশাহ, লেখা পেয়ে যাবেন।' হেকিম রায়ানের উত্তর।

খানিকক্ষণ পর কেমন যেন করে উঠল বাদশাহর শরীর। মাথাটাও দুলে উঠল যেন। মোচড় দিয়ে উঠল পেটের ভেতরটা। হঠাৎ বাদশাহ চেঁচিয়ে উঠলেন,

'বিষ! বিষ! বইয়ের পাতায় বিষ মাখানো আছে...!!!' বলেই ঢলে পড়লেন তিনি।

এবার জেলে কলসবন্দি দৈত্যকে বলল,

'কী দৈত্যসম্রাট! এই গল্পটা থেকে শিক্ষা নিতে পেরেছ তো কিছু? উপকারীকে আল্লাহ কীভাবে রক্ষা করেন আর নির্দোষকে কীভাবে বাঁচিয়ে দেন দেখলে তো? তোমার উপকার করেছিলাম বলে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে। এখন তোমাকে নদীতে ফেলে দিয়ে ঘরে ফিরে যাব। এভাবেই আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন।'

এবার দৈত্যটা কলসের ভেতর থেকে 'আমাকে ছেড়ে দাও' বলে কান্নাকাটি করতে লাগল। এমনভাবে মিনতি করতে লাগল যে দয়া হল জেলের। কলসের মুখটা খুলে দিল সে। অমনি কলস থেকে বেরিয়ে এল দৈত্যটা। হেসে উঠল ভীষণ জোরে।

জেলে ভাবল আর তার বাঁচার উপায় নেই। দৈত্যটাকে আবারও বিশ্বাস করা উচিত হয়নি। মনে মনে দৈত্যের হাতে মরার জন্য প্রস্তুত হল জেলে। কিন্তু দৈত্যটা ভারি গলায় বলে উঠল,

'এস আমার সঙ্গে।' বলেই লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল দৈত্যটা। জেলেকে নিয়ে সে হাজির হল পাহাড়ের কাছে একটা উপত্যকায়। তার মাঝখানে টলটলে স্বচ্ছ পানির একটা হ্রদ। দৈত্য বলল,

'জাল ফেল।'

জেলে জাল ফেলল। চারটি মাছ উঠল চার রঙের। দৈত্য বলল,

'রোজ এখানে এসে একবার জাল ফেলবে। এরকম চারটি মাছ উঠবে রোজ। সেগুলো বিক্রি করে সুখে-শান্তিতে দিন কাটবে তোমার। আমি চললাম।'

এই বলে এক লাফে শূন্যে উঠে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল দৈত্যটা।

সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেল জেলের।

আলাদিনের আশ্চার্য প্রদীপ

চীনদেশে ছিল এক গরিব দরজি। তার ছেলের নাম আলাদিন। আলাদিন একদিন বড় হবে। লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হবে। বাবা-মায়ের আর কোনো দুঃখই থাকবে না—এই ছিল দরজির আশা।

কিন্তু আলাদিন অন্য রকম ছেলে। লেখাপড়ায় তার মন নেই। সারাদিন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হইচই করে ঘুরে বেড়ায়। আড্ডা মারে, কাজ করে না। আলাদিনের বয়স তখন পনের বছর। এই সময় তার বাবার হল এক কঠিন অসুখ। ছেলের জন্য এক বুক দুঃখ নিয়ে গরিব দরজি বেচারা মারা গেল। সংসার চালায় তখন আলাদিনের মা।

একদিন আলাদিন ঘুরতে ঘুরতে দেখা পেল এক বুড়ো দরবেশের।

'এই ছেলে, তোমার নামই তো আলাদিন। তোমার বাবা ছিল এক দরজি।'

আলাদিন শুনে অবাক!

'আমি তোমার বাবার ভাই। সে প্রায় অনেক আগের কথা। ত্রিশ বছর আগে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম আমি। চল, তোমাদের বাড়ি যাব এখন।'

পথে যেতে যেতে বুড়ো শুনল আলাদিনের বাবা বেঁচে নেই। শুনেই হাউ হাউ করে সে কী কান্না বুড়োর! বুড়ো বাড়িতে এসে আলাদিনকে দশটা সোনার মোহর দিল। আলাদিনের মা তো ভারি খুশি। যাক, তিনি এখন আর একা নন।

বুড়ো দরবেশ দুদিন থাকল আলাদিনদের বাড়িতে। দেখল, আলাদিনরা খুব কষ্টে থাকে। বুড়ো আলাদিনের মাকে বলল, ছেলেটিকে নিয়ে আর কোনো চিন্তার কারণ নেই। ওকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শহরে যাবেন। শহরে তার কাপড়ের দোকান আছে। আলাদিন এখন থেকে সেই ব্যবসা দেখাশোনা করবে।

একদিন ভোরে আলাদিনকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিল দরবেশ। হাঁটতে হাঁটতে পথ আর ফুরোয় না ওদের। শহর পেরিয়ে ওরা চলল এক বনের দিকে। ঘন বন। বন পেরিয়ে ওরা এল পাহাড়ের ধারে। আলাদিনকে একটু বিশ্রাম করতে বলে বুড়ো পকেট থেকে বের করল একটা কৌটা। চকমকি পাথর বের করে জ্বালালো আগুন। ধোঁয়ার কুণ্ডলি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। জ্বলে উঠল বিশাল পাহাড়টা। তারপরই পাহাড় ফেটে তৈরি হল এক গভীর গর্ত!

বুড়ো বলল, 'আলাদিন, গর্তের মধ্যে কী আছে দেখ।'

আলাদিন তাকিয়ে বলল, 'দুটো পেতলের ধামা।'

বুড়ো বলল, 'গর্তে নেমে ধামা দুটো সরিয়ে ফেল। দেখবে নিচে রয়েছে অনেক ধনরত্ন। যা পাব ভাগ করে নেব আমরা দুজনে।'

লোভে চকচক করে উঠল আলাদিনের চোখ।

'আমার নাম বলা নিষেধ। জাদু গণনা করে দেখেছি—এই ধনরত্ন একমাত্র তুমিই উদ্ধার করতে পার।'

আলাদিন গর্তে নেমে গেল এক লাফে। বুড়ো উপর থেকে বলতে লাগল, 'সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে থাক। পর পর তিনটে ঘর দেখতে পাবে। প্রথম ঘরে আছে তামার পাত্রে গলানো সোনা, দ্বিতীয় ঘরে রুপোর পাত্রে গুঁড়ো সোনা আর শেষ ঘরে সোনার পাত্রে সোনার মোহর। তারপর হাঁটা ধরবে সামনে। বাগান পেরিয়ে দেখতে পাবে একটা ঘর। ঘরের মধ্যে মিটিমিটি জ্বলছে একটা প্রদীপ। প্রদীপটা নিয়ে এসে আমাকে দেবে।'

বুড়ো দরবেশ একটা আংটি দিল আলাদিনকে।

নিশ্চিন্ত মনে আলাদিন নেমে গেল গভীর গর্তে। যে-ভাবে যাওয়ার কথা ছিল সে-ভাবেই ফিরে এল সে। বুড়ো ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'দাও, প্রদীপটা আমাকে দাও।' আলাদিন বলল, 'আগে উঠে নিই। তারপর দিচ্ছি।' 'না—' বলে চিৎকার করে উঠল বুড়ো। 'শিগগির দে—' বলতে বলতে চেহারা পাল্টে গেল বুড়োর। 'আমি তোর কেউ নই। তুই-ই প্রদীপটা আনতে পারবি বলে এই ছলনা। তোকে আমি নিয়ে এসেছি। জলদি দে।' বলতে বলতে বুড়ো আলাদিনের হাতে থাবা মারল। ধাক্কা সামলাতে না পেরে আলাদিন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল গর্তের মধ্যে।

বুড়ো হায় হায় করে উঠল। 'আমাকে ফাঁকি দেয়া অত সহজ নয় হারামজাদা—'

বলে বুড়ো পাথরের চাঁইটা দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিল। আবার সে মন্ত্র পড়ে পাহাড়ের ফাটল দিল বন্ধ করে। আলাদিনের সম্বিৎ ফিরল কিছুক্ষণ পর। ধাক্কাধাক্কি, চিৎকার, চেঁচামেচি করল অনেকক্ষণ। তারপর সে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল। চুপচাপ। আনমনে হাতের আংটিটা প্রদীপের সঙ্গে দু-একবার ঘষা লাগতেই একটা দৈত্য এসে হাজির হল সামনে।

'আমি আংটির দাস। হুকুম করুন।'

আলাদিন ভয়ে ভয়ে বলল,

'আমি খোলা আকাশের নিচে যেতে চাই।' মুহূর্তে আলাদিন টের পেল, সে গুহার বাইরে। মনের দুঃখে ক্লান্ত-শ্রান্ত আলাদিন বাড়ি ফিরে এল। মাকে খুলে বলল সব। শুনে মা ভারি অবাক! প্রদীপটা নেড়েচেড়ে দেখল মা। আলাদিনকে বলল, 'ঘরে এখন একটিও পয়সা নেই। যা প্রদীপটা বেচে কিছু নিয়ে আয়।' ময়লা প্রদীপটা সাফ-সুতরো করতে বসল আলাদিন। অমনি এসে হাজির হল এক বিশাল দৈত্য।

'আমি প্রদীপের দৈত্য। হুকুম করুন।'

আলাদিন সাহস নিয়ে বলল, 'কিছু খাবার চাই।'

অমনি সোনার থালায় রকমারি খাবার এসে হাজির। মা অবাক! সাতদিনেও সে খাবার খেয়ে শেষ করা যায় না। সোনার থালা বিক্রি করেও পয়সা আসতে লাগল। কিছুদিন পর পর আংটি ঘষলেই দৈত্য এসে হাজির হয়। সোনার থালায় নিয়ে আসে সোনার খাবার। অবস্থা ফিরে গেল আলাদিনের। সুখেই দিন কাটছে মা-ছেলের।

একদিন বন্ধুর দোকানে বসে গল্প করছে আলাদিন। সুলতানের মেয়ে বুদুর। সে যাচ্ছিল গোসল করতে। সঙ্গে রয়েছে পাইক-বরকন্দাজ। 'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও— ।'

আলাদিন লুকিয়ে দেখে নিল রাজকন্যাকে। মন হরণ হয়ে গেল তার। রাজকন্যার কথা ভেবে ভেবে সে অস্থির! ঘরে সে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকে। শেষে মাকে বলল, রাজকন্যেকে বিয়ে করবে সে। দরজির ছেলের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে? এ-ও কি সম্ভব? কিন্তু আলাদিন নাছোড় । ধনরত্নের অভাব নেই তার। সুলতানকে সে বিপুল ঐশ্বর্যের ভেট পাঠাল। সুলতান তো মহাখুশি। তিনি রাজি। কিন্তু ধূর্ত উজির বললেন,

'না, তিনমাস পর এর দশগুণ ভেট পাঠাতে হবে। ইতিমধ্যে ছেলের খোঁজ-খবর নেয়া হবে।'

শুনে আলাদিন মহাখুশি। কিন্তু উজিরের মনে অন্য বুদ্ধি। সে রাজকন্যেকে বিয়ে দেবে তার ছেলের সঙ্গে। ছেলেটি ছিল যেমন হাবাগোবা দেখতে তেমনি কদাকার। একদিন সুযোগ বুঝে উজির সুলতানকে গিয়ে বলল, 'দুঃসংবাদ জাঁহাপনা। সেই আলাদিন নামের ছেলেটি বাণিজ্য করতে গিয়ে জাহাজডুবি হয়ে মারা গেছে।'

সুলতান ভারি দুঃখ পেলেন। এই সুযোগে উজিরের ছেলের সঙ্গে বুদুরের বিয়েটা পাকা হয়ে গেল। আলাদিনের কাছে খবর এল। প্রাণ কেঁপে উঠল আলাদিনের। তাড়াতাড়ি দশগুণ উপহারসামগ্রী পাঠাল সে সুলতানের দরবারে। কিন্তু হায়! উজিরের সেপাইরা দরজা থেকেই ফেরত পাঠাল আলাদিনের মাকে।

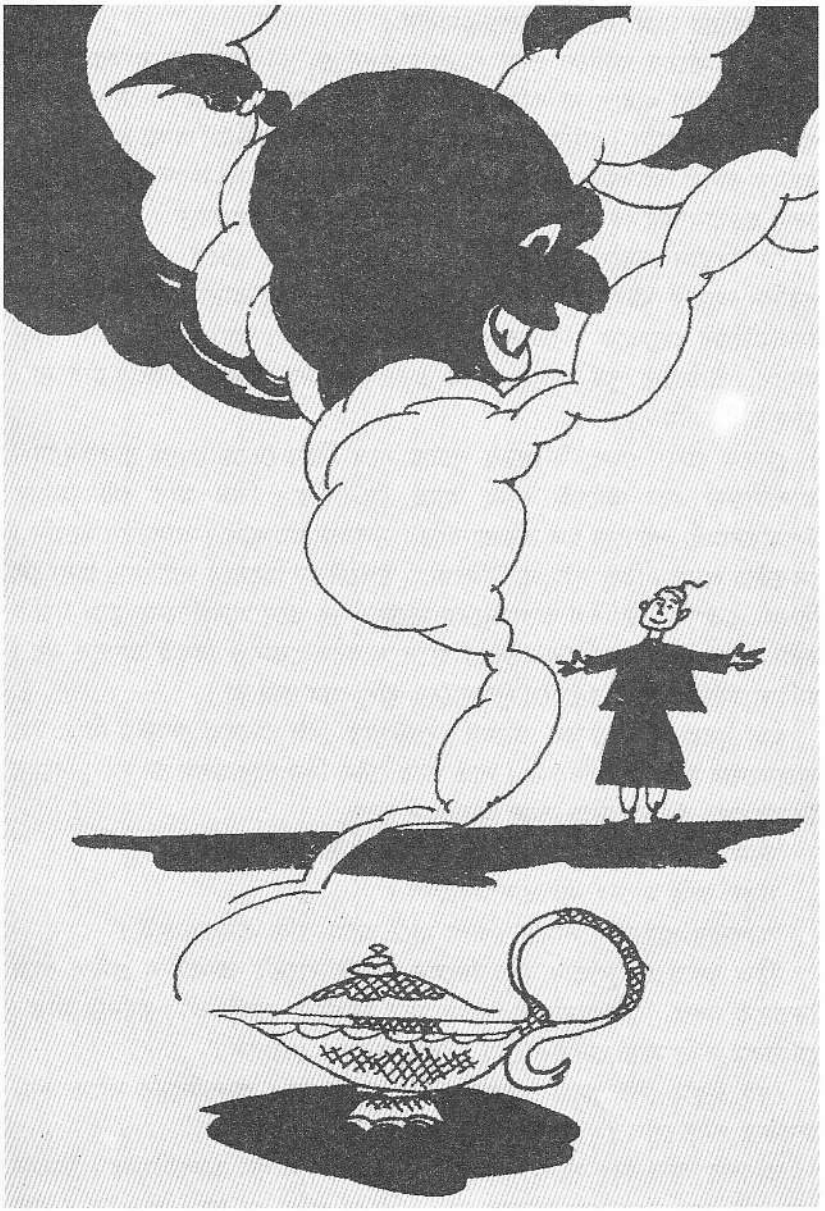

সেই রাতেই ঢোল-নাকাড়া বেজে উঠল। খানাপিনার ঢল বইল। ধুমধাম করে উজির-পুত্রের সঙ্গে বিয়ে হল রাজকুমারীর।

চিন্তায় মায়ের কপালে ভাঁজ পড়ল। এখন যে কী করে বসবে আলাদিন? আলাদিন মাথা খারাপ না করে অন্য কাজ করে বসল। প্রদীপের দৈত্যকে সে পাঠাল রাজপ্রাসাদে। বাসরঘর থেকে বর-কনেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হল। বরকে আটকে রাখল অন্ধকার চোরকুঠুরিতে। সারারাত সে আলাপ করল কনের সঙ্গে। ভোর হওয়ার আগেই আবার তাকে ফেরত পাঠানো হল প্রাসাদে।

কে বিশ্বাস করবে এই কথা? বর-কনে দুজনেই চেপে গেল বিষয়টা। পরদিন আবার ঘটল সেই একই ঘটনা। মেয়ে তখন কান্নাকাটি শুরু করল। রাজা-উজির ছেলেকে জিজ্ঞেস করে ঘটনা শুনলেন। তাদের তো শুনে মাথা খারাপ। উজিরের পুত্র বলল, 'আমি এভাবে রাজার জামাই থাকতে চাই না। মুক্তি চাই আমি।'

লোকে জেনে গেল, উজিরের পুত্রের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে গেছে রাজকন্যার। আলাদিনের তো আগেই জানা আছে সে খবর। তিন মাস পর আবার উপহারসামগ্রী পাঠানো হল রাজপ্রাসাদে। সুলতান মহাখুশি। আলাদিন মরেনি। সে বেঁচে আছে। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি উজিরের। উপঢৌকন হিসেবে পাঠানোর জন্য সে বিশাল এক ফিরিস্তি দিল আলাদিনের মাকে। সব শুনে আলাদিনের মুখে মুচকি হাসি খেলে গেল। প্রদীপের দৈত্য হাতে থাকতে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। চাহিদা মাফিক উপহার পেয়ে সুলতানের খুশি আর ধরে না।

মহা ধুমধামে বিয়ে হল তাদের। পেটপুরে খেল দেশের লোক। বিয়ে হল রাজকন্যের সঙ্গে আলাদিনের। সাত সাত চৌদ্দ দিন ধরে চলল উৎসব। বিয়ের উৎসব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলাদিন বলল,

'আজই আমি কন্যেকে নিয়ে নতুন বাড়িতে উঠব।'

'নতুন বাড়ি মানে?' সুলতান শুধালেন।

'আপনার প্রাসাদের সামনে খোলা মাঠে আমি বাড়ি বানাতে চাই।'

'ঠিক আছে।' সুলতান সায় দিলেন। সেই রাতেই আলাদিন প্রদীপ ঘষে দৈত্যকে বলল, 'রাজপ্রাসাদের খোলা মাঠে চমৎকার একটা বাড়ি বানিয়ে দাও। যে-রকম বাড়ি সারা দেশেও নেই। কেউ চোখেও দেখেনি।'

যেই হুকুম সেই কাজ। সুলতান অবাক হলেন। আলাদিনের নামে জয়-জয়কার পড়ে গেল।

তারপর আর কী? সুখে-শান্তিতে দিন কাটতে লাগল আলাদিনের। জীবনে কত কষ্ট, কত দুঃখ সহ্য করেছে সে। গরিবের জ্বালা সে ছাড়া আর কে বুঝতে পারে। দুঃখীদের জন্য তাই আলাদিনের অন্য রকম মমতা। গরিব-দুঃখীদের

জন্য ছিল সে মুক্তহস্ত। তার কাছে কেউ এসে খালি হাতে ফেরত যেত না। দেশের লোকও সকালে-বিকালে আলাদিনের নাম মুখে নেয়।

মানুষের জীবনে সুখ কি নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকে? থাকে না বলেই দিনের পরে আসে রাত। আলোর পরে আসে অন্ধকার। সুখের পর আসে দুঃখ।

সেই যে দরবেশ, তারও কম ছিল না জাদুকরি শক্তি!

একদিন সে গণনা করতে করতে আলাদিনের খবর বের করল। প্রদীপটা কোথায় আছে সেটাও সে জেনে গেল। আর দেরি নয়। ছুটল দরবেশ সুলতানের প্রাসাদে। এসে সে শুনল, আলাদিন গেছে শিকারে। আর প্রদীপটা আছে আলাদিনের শিয়রের তলায়। এই তো সুযোগ। চালাক দরবেশ ঝুলি হাতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর বলতে লাগল, 'প্রদীপ নেবেন গো প্রদীপ। পুরনো প্রদীপ বদলে নতুন প্রদীপ নেবেন গো কেউ!'

রাজকন্যের কানে গেল সেই কথা। কেউ জানত না এই প্রদীপের কী গুণ! রাজকন্যে ভাবল, পুরনো প্রদীপ রেখে লাভ কী! পাল্টে নতুন প্রদীপ নিয়ে নিই একটা।

বুড়ো দরবেশ মহা খুশি। প্রদীপ ঘষতেই দৈত্য এসে হাজির—'আমি প্রদীপের দাস। হুকুম করুন।'

বুড়োর মুখে রহস্যময় হাসি খেলে গেল।

'আলাদিনের রাজপ্রাসাদটা নিয়ে চল গহীন বনে।' সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল। সকালে সুলতান দেখলেন রাজপ্রাসাদ নেই। সামনে ধু ধু মাঠ। এ কী ব্যাপার! 'শিগগির বন্দি করে নিয়ে এস আলাদিনকে।' সুযোগ বুঝে উজির বলল, আলাদিন নিশ্চয়ই একটা ভণ্ড জাদুকর। সবই ছিল তার প্রতারণা। শিকারের তাঁবু থেকে বন্দি করে নিয়ে আসা হল আলাদিনকে। আলাদিন বুঝে ফেলল ব্যাপারটা কী! বুক তার শুকিয়ে কাঠ। ভয়ে আতঙ্কে প্রায় মরো মরো অবস্থা তার। সুলতান গম্ভীরভাবে বললেন, 'জল্লাদ—ওর গর্দান কেটে নাও।'

কিন্তু এরকম অন্যায় হুকুমের প্রতিবাদ উঠল জনতার মধ্যে থেকে। কারণ দেশের মানুষ আলাদিনকে খুব ভালোবাসত। জ্বলে উঠল বিদ্রোহের আগুন। প্রাসাদ ঘেরাও করে রাখল জনতা। আলাদিনকে হত্যা করা চলবে না।

সুলতান উপায় খুঁজে না পেয়ে মুক্তি দিলেন আলাদিনকে। কিন্তু এক শর্তে। চল্লিশ দিনের মধ্যে খবর নিয়ে আসতে হবে রাজকন্যের। আলাদিন কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'জাঁহাপনা রাজকন্যে কি শুধুই আপনার মেয়ে? সে কি আমাদের কেউ নয়?'

রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পথে নেমে এল আলাদিন। মনের দুঃখে হতাশায় ক্ষোভে সে বিপর্যস্ত। দিন যায়। রাত আসে। পথে যাকে পায় তাকেই আলাদিন জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা কি এক বুড়ো দরবেশকে দেখেছ?'

কোনও উত্তর পাওয়া যায় না কারও কাছ থেকে। তবুও ভেঙে পড়ে না সে। ধৈর্য ধরে বুদ্ধি খোঁজে।

একদিন। খিদেয় কাতর হয়ে এক নদীর ধারে বসে আলাদিন। দুঃখে গড়া তার জীবনের কথা সে ভাবছে। রাজকন্যেকে ছেড়ে বেঁচে থেকে কী লাভ তার? পরম হতাশায় দুহাত দিয়ে দুই গাল ঘষতে লাগল সে।

এমন সময় আচমকা হাজির হল সেই আংটির দৈত্য।

'হুকুম করুন আমায়।' আলাদিন চমকে উঠল। আংটির কথা সে ভুলেই গিয়েছিল এতদিন। আলাদিন সব দুঃখের কথা শোনাল তাকে। আলাদিনের কথায় যেন প্রাণও গলে যায়। কিন্তু দৈত্য জানাল,

'প্রদীপের দৈত্য আমার ওস্তাদ, তাঁর বিরুদ্ধে আমার কিছুই করার নেই। তবে আমি তোমাকে তোমার প্রাসাদে পৌঁছে দিতে পারি।'

মুহূর্তে আলাদিন পৌঁছে গেল সেই গহীন বনে। গাছপালার নির্জনে তার নিজের প্রাসাদের সামনে হাজির হল সে। চারিদিকে সুনসান নীরবতা; নিরিবিলি, নিস্তব্ধতা। আলাদিন রাজকন্যের ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে রইল উদাস মনে সারাদিন।

এক সময় ঘর অন্ধকার হয়ে রাত হল। তবু কোনও সাড়া মেলে না। কেউ কি নেই এই প্রাসাদে? আংটির দৈত্যকে আবার ডেকে আনল আলাদিন। বলল,

রাজকন্যের সঙ্গে তার একটু দেখা করিয়ে দেয়া দরকার।

জানলার সামনে এসে দাঁড়াল রাজকন্যে। বলল, 'আমার মন ভালো নেই। তবু সৌভাগ্য! তুমি এসেছ শেষমেশ।' বুড়ো দরবেশ তাকে কোনো কষ্ট দেয়নি। দুর্ব্যবহার করেনি তার সঙ্গে। প্রদীপটা দরবেশ রেখেছে তার জোব্বার মধ্যে। গোপন পকেটে।

বুদ্ধি বার করতে হবে এখন। আলাদিন ইশারায় কন্যেকে বুঝিয়ে দিল বুড়োকে অজ্ঞান করতে হবে জহর-মেশানো শরবত খাইয়ে। এই শরবত খেয়ে বুড়োর ঘুম ভাঙবে না কোনওদিন। ঠিক ঠিক হলও তাই। রাজকন্যে বুড়োকে জহরের শরবত খাওয়াল। চিরকালের ঘুমে তলিয়ে গেল বুড়ো দরবেশ। বুড়োর পকেট থেকে প্রদীপটা বের করে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল আলাদিন। প্রদীপটা ঘষতেই হাজির হল সেই দৈত্য।

'আমি প্রদীপের দাস। হুকুম করুন আমাকে। প্রদীপ যার আমি তার।'

আলাদিন বলল,

'প্রাসাদ যেখানে ছিল আমি আবার সেখানেই যেতে চাই। পৌঁছে দাও আমাকে।' প্রাসাদটা একটু টলে উঠল মাত্র। পর মুহূর্তেই বোঝা গেল সুলতানের প্রাসাদের সামনে এসে তারা হাজির। রাত তখন গভীর।

সকালে ঘুম ভাঙতেই সবাই দেখল, রাজকন্যের প্রাসাদটি আবার আগের জায়গাতেই ফিরে এসেছে। সবাই এসে ভিড় জমাল প্রাসাদের সামনে। আলাদিন আর রাজকন্যে বেরিয়ে এল প্রাসাদ থেকে। সুলতানের খুশি আর ধরে না। মাপ চাইল সুলতান। 'আলাদিন না বুঝে আমি অনেক কিছু বলে ফেলেছি তোমাকে।'

আলাদিন মাথা নামিয়ে রইল বিনয়ে।

আবার শান্তি নেমে এল তার জীবনে।

রাজ্য জুড়ে আনন্দের উৎসব শুরু হল। সবাই খেল পেট ভরে। আলাদিনকে আশীর্বাদ করতে লাগল দুহাত তুলে। সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে-আহ্লাদে দিন কাটতে লাগল তাদের। একদিন বুড়ো সুলতান অসুস্থ হয়ে গেলেন। বুড়ো বয়সে নানা অসুখ-বিসুখে তিনি কাতর।

দেশের লোক আলাদিনকেই নতুন সুলতানের সিংহাসনে বসাল। দিকে দিকে তার নামে জয়ধ্বনি। রাজ্যে নেমে এল অপার শান্তি। কারণ আলাদিন গরিবের দুঃখ বোঝে। সে হল গরিবের বন্ধু।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

চুম্বক পাহাড়ের গল্প

এক ছিল বাদশাহ। নাম তাঁর কালান্দর। তাঁর বাবা ছিলেন বাদশাহ কাসিব। বাদশাহ কাসিব যখন মরে গেলেন তখন সিংহাসনে বসলেন কালান্দর। তাঁর শাসনে দেশের মানুষ ছিল সুখী। কারণ বাদশাহর মনটা ছিল উদার। আর মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অসীম ভালোবাসা।

কালান্দর বাদশাহর দেশটা ছিল সমুদ্রের পাড়ে। ফলে ছোটবেলা থেকে তাঁর রক্তে মিশে গিয়েছিল সমুদ্র ভ্রমণের নেশা। সমুদ্রের গভীরে অনেক দূরে বেশ কিছু দ্বীপ ছিল এই কালান্দর বাদশাহর দখলে। মাঝে মাঝেই যুদ্ধজাহাজ আর সৈন্যসামন্ত নিয়ে কালান্দর বাদশাহ যেতেন সেই দ্বীপ পরিদর্শনে।

একবার এইরকম এক দ্বীপ পরিদর্শনে যাবার সময় সমুদ্রে উঠল ভয়ঙ্কর ঝড়। সারারাত উত্তাল সমুদ্রের বুকে মরণের সঙ্গে লড়াই করে কেটেছে তাঁদের সময়। রাত্রি শেষে ঝড় থামল। শুরু হল সুন্দর হাসি-ঝলমল রোদেলা দিন। ঝড়ের তাণ্ডবে কালান্দর বাদশাহর জাহাজগুলো আটকে গিয়েছিল এক ছোট্ট দ্বীপে। একটু বিশ্রামের জন্য সবাই এই দ্বীপে নেমে এল। বিশ্রাম নিতে নিতে কালান্দর বাদশাহ তাকালেন সমুদ্রের দিকে। অবোধ শিশুর মতো শান্ত সমুদ্রকে দেখলে এখন মনেই হয় না যে এই সমুদ্রই রাতে এমন তাণ্ডব চালিয়েছিল। সমুদ্রের গভীর নীল জলের সৌন্দর্য যেন বাদশাহ কালান্দরের মনে এনে দিল কবিতার গন্ধ।

কয়েকদিন এই ছোট্ট দ্বীপে বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলেন বাদশাহ। কুড়ি দিন ধরে গভীর সমুদ্রে জাহাজ চালিয়েও হারানো পথের কোনও নিশানা পাওয়া গেল না। দিশাহারা হয়ে অথৈ সমুদ্রে দাঁড় টানছে মাল্লারা। বৃদ্ধ অভিজ্ঞ কাপ্তেনের কপালেও ফুটে উঠেছে কুঞ্চিত রেখা। বাদশাহর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

কিছুতেই চেনা সমুদ্রের পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাদশাহ কালান্দর এক ডুবুরিকে সমুদ্রে নামিয়ে দেয়ার হুকুম দিলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল ডুবুরি। অনেকগুলো বড় মাছ দেখা যাচ্ছে গভীর সমুদ্রে। আর দূরে দেখা যাচ্ছে একটা পাহাড়। শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন কাপ্তেন,

'আর রক্ষা নেই আমাদের। আমরা চুম্বক পাহাড়ের কাছে এসে পড়েছি। পাহাড়ের গায়ে গাঁথা আছে হাজার চুম্বক লোহার বর্শা। আমাদের জাহাজ যতই তার কাছে যেতে থাকবে সেই চুম্বকের প্রচণ্ড আকর্ষণ ততই টেনে নেবে জাহাজকে। জোরে এগুতে এগুতে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যাবে জাহাজগুলো। মৃত্যু নিশ্চিন্ত আমাদের জাঁহাপনা। এই পাহাড়ের আকর্ষণ ভীষণ তীব্র। কত যে জাহাজ আর মানুষ এখানে প্রাণ হারিয়েছে তার কোনও লেখাজোখা নেই! আমরাও মরব তাদের মতো।'

কাপ্তেন প্রাণভয়ে কাতর হয়ে কাঁদছিল। কারণ এই চুম্বক পাহাড়ের ভয়াবহতার কথা সে-ই জানে সবচেয়ে বেশি। সমুদ্রে জাহাজ চালাতে গেলে সব কাপ্তেনই এই এলাকার বাইরে থাকতে চেষ্টা করে। ওস্তাদ কাপ্তেনরা এই পাহাড়ের কথা সব সময় স্মরণ করিয়ে দেন তাদের শিষ্যদের। যে মানুষ জানে যে সামনে অপেক্ষা করছে নিশ্চিত মৃত্যু সে তো কাঁদবেই। জাহাজের অন্যেরা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাদের মনে ভয়ও নেই। কাপ্তেন কাঁদতে কাঁদতে জানাল,

'চুম্বক পাহাড়ের চূড়ায় আছে একটা গম্বুজ। দশটা পিতলের খুঁটির উপর দাঁড় করানো আছে সেই গম্বুজটা। তার উপরে আছে এক তামার তৈরি ঘোড়সওয়ার। তার এক হাতে আছে ঢাল আর অন্য হাতে তলোয়ার। বুকে বর্ম, মাথায় শিরস্ত্রাণ। যুদ্ধসাজে সজ্জিত যোদ্ধা সে। সীসার ফলকে লেখা এক দৈববাণী আঁটা তার বুকে। লোকে বলে ঐ ঘোড়সওয়ার যোদ্ধাটি যতদিন ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে ততদিন কোনও জাহাজের নিস্তার নেই। এই সমুদ্র-এলাকায় গেলেই চুম্বকের আকর্ষণ টেনে নেবে জাহাজকে। এভাবে কত জাহাজ যে এই পাহাড়ে এসে ধ্বংস হয়েছে তার হিসাব নেই। যদি কেউ ঐ ঘোড়সওয়ারকে ওখান থেকে ফেলে দিতে পারে তাহলেই শুধু এই চুম্বক পাহাড় থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে।'

কাপ্তেনের কথা শুনে সবাই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তাদের মনে একই ভাবনা, না জানি তাদের কোন মহাপাপের শাস্তি দিচ্ছেন আল্লাহ।

পরের দিন সকালে কাপ্তেন জানাল জাহাজগুলো চুম্বক পাহাড়ের একেবারে কাছে চলে এসেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে সব জাহাজ। সবাই যেন আল্লাহর নাম জপতে থাকে।

কাপ্তেনের কথা শেষ হতে-না-হতেই প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল কালান্দর বাদশাহর সব জাহাজ। কালান্দর বাদশাহ ঝড়ের তাণ্ডবের মধ্যে

সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ে ভাসতে লাগলেন। ভাবলেন মৃত্যু তো নিশ্চিত! তারপর আর কিছু মনে নেই তাঁর। জ্ঞান ফিরলে দেখলেন শুয়ে আছেন সেই পাহাড়টার নিচে এক বালির চড়ায়। জলোচ্ছ্বাসের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়নি। এ নিশ্চয়ই তাঁর পরম সৌভাগ্য। নইলে এতক্ষণে হাঙর-কুমিরের পেটে চলে যাবার কথা। এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়ালেন কালান্দর বাদশাহ। দেখলেন একটা পথ সোজা উঠে গেছে পাহাড়ের চূড়ার দিকে। পথ ধরে এগিয়ে চললেন তিনি। আল্লাহর কী অপার মহিমা! এতক্ষণ বিপরীত দিক থেকে প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছিল। এই তীব্র বাতাসের বাধা পেরিয়ে সোজা খাড়া পাহাড়ের উপর ওঠা একেবারেই অসম্ভব। হঠাৎ করে উল্টে গেল বাতাসের গতি। যেন বাতাসই কালান্দর বাদশাহকে ঠেলে উপরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একসময় কালান্দর বাদশাহ আবিষ্কার করলেন কাপ্তেন চুম্বক পাহাড়ের চূড়ার যে গম্বুজের কথা বলেছিলেন সেই গম্বুজের নিচে এসে পড়েছেন তিনি। ক্লান্তি আর অবসন্নতায় ভেঙে এল শরীর। ওখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন বাদশাহ।

ঘুমের মধ্যে বাদশাহ কালান্দর শুনতে পেলেন এক দৈববাণী।

'শোনো কাসিবের পুত্র, ঘুম থেকে জাগো। তোমার পায়ের ঠিক তলায় গর্ত খুঁড়ে দেখ। একখানা তীর আর ধনুক পাবে। এই ধনুকটাতে আছে দৈবের শক্তি। তারপর ঐ ধনুকে তীর গেঁথে ঘোড়সওয়ারকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দেবে। তাহলে দেখবে তামার ঘোড়সওয়ার সমুদ্রে ডুবে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তোমার হাত থেকেও পড়ে যাবে ধনুকটা। যে গর্ত খুঁড়ে তুলবে ধনুকটা, সেই গর্তে রেখেই ধনুকটাকে আবার মাটিচাপা দিয়ে রাখবে। তাকাবে তারপর সামনের দিকে। দেখবে সমুদ্রের পানি তোমার পায়ের তলার পাহাড়-চূড়ার সমান হয়ে যাবে। দেখতে পাবে একটা ডিঙি নৌকা বেয়ে এক লোক এগিয়ে আসছে তোমার দিকে। ডিঙির লোকটা দেখতে একেবারে তামার সেই ঘোড়সওয়ারের মতো মনে হবে। কিন্তু আসলে সে তা নয়। নৌকায় বোঝাই করা থাকবে মড়ার খুলি। সে আসবে তোমাকে পার করে দিতে। কিন্তু সাবধান! ভুলেও নৌকায় উঠে আল্লাহর নাম উচ্চারণ কোরো না। একটানা দশদিন ধরে সেই নৌকায় থাকবে। তারপর দেখবে তুমি তোমার চেনা সমুদ্রে এসে পড়েছ। সেখানে দেখতে পাবে সওদাগরের নৌকা। তারা তোমাকে তুলে নিয়ে পৌঁছে দেবে তোমার দেশে। কিন্তু আবার সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে, ভুলেও কখনও আল্লাহর নাম উচ্চারণ কোরো না।'

দৈববাণী শুনতে শুনতে বাদশাহর ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। দৈববাণীর কথামতো সব কাজ করলেন বাদশাহ। সব ঘটনা মিলে যেতে লাগল দৈববাণীর সঙ্গে। বাদশাহ যখন নিজের চেনাজানা সমুদ্রে এসে পড়লেন তখন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে এল তাঁর। 'আল্লাহ তুমি সর্বশক্তিমান। তোমার দোয়াতেই

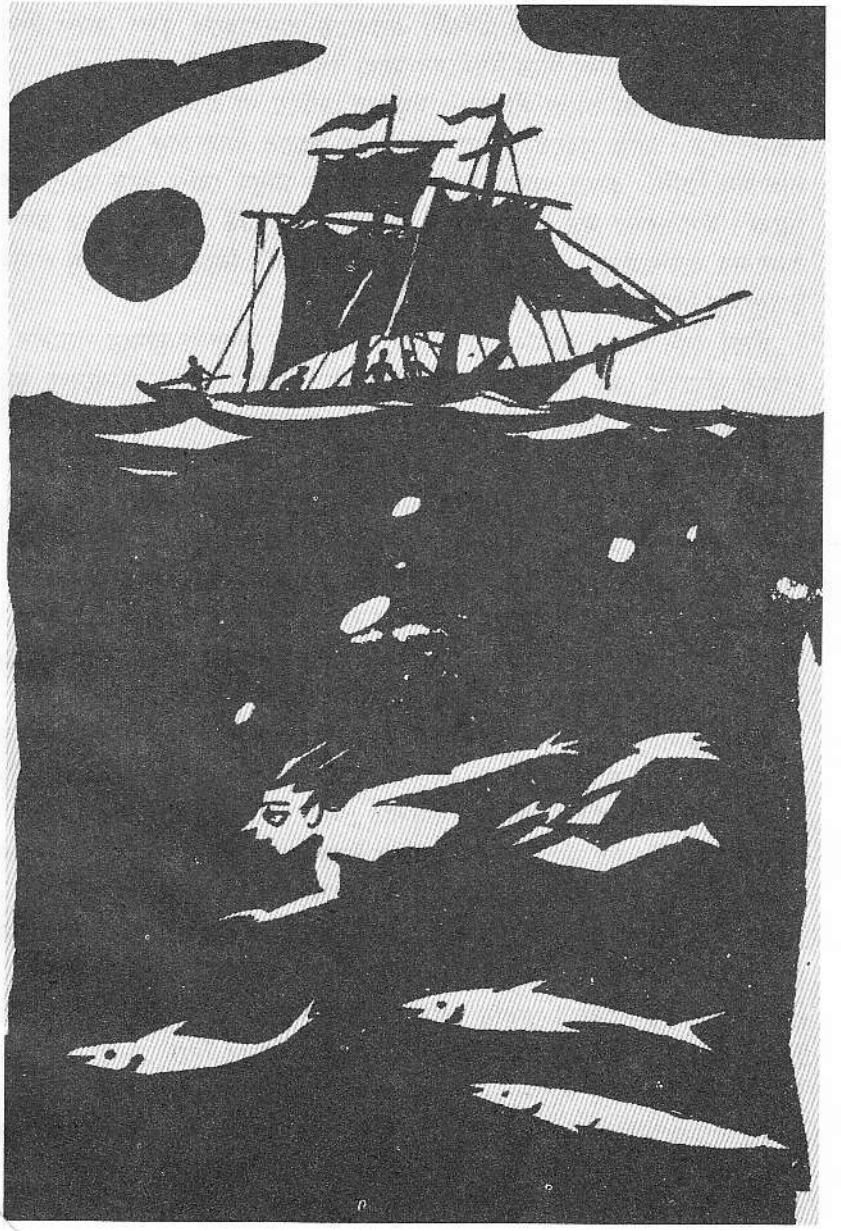

আমি আবার দেশে ফিরে আসতে পেরেছি। তুমিই একমাত্র প্রভু...।' মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। পিতলের মাঝিটা একহাতে বাদশাহকে তুলে ফেলে দিল সমুদ্রে। তারপর নৌকা নিয়ে নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

বাদশাহ ছিলেন ভালো সাঁতারু। সমুদ্রের ঢেউয়ে গা এলিয়ে ভেসে রইলেন কোনওমতে। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর ভয়! প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলেন তিনি। কারণ অসহায় অবস্থায় পড়লে মানুষ বেশি করে আল্লাহকে ডাকে। মসজিদের বড় বড় গম্বুজের চূড়ার মতো ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে চলল কালান্দর বাদশাহকে। একসময় তিনি দেখলেন একটা বিরাট ঢেউ এসে তাঁকে উপকূলের দিকে ছুড়ে দিয়ে চলে গেল।

তীরে এসে গায়ের জামাকাপড় শুকাতে দিয়ে ক্লান্ত বাদশাহ ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই সেই দিন আর রাত্রি পার করে দিলেন তিনি। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই শুকনো কাপড়গুলো পরে নিলেন। সামনে দেখলেন সুন্দর সবুজ শস্যক্ষেত্র। আনন্দে নেচে উঠল মন। চারদিকে সমুদ্রঘেরা এই ছোট সবুজ শস্যভরা দ্বীপটিকে খুব ভালো লাগল বাদশাহর। কিন্তু পরক্ষণেই দুঃখ জড়িয়ে ধরল তাঁকে। নিজেকে ভীষণ হতভাগ্য মনে হতে লাগল। একটা ভুলের জন্য আজ তাঁর আর নিজের দেশে ফেরা হল না। কে জানে আর কোনওদিন ফেরা হবে কি-না। কী আর করা! যে করেই হোক বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। বিপদে পড়ে ভয় পেলে চলবে না। সাহস নিয়ে বিপদের মোকাবেলা করতে হবে। কোনও দুর্বল মানুষকে আল্লাহ সহযোগিতা করেন না।

হঠাৎ কালান্দর বাদশাহ দেখলেন একটা জাহাজ যেন এই দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন একটা ঝোপের আড়ালে। একটা উঁচু গাছের ডালে উঠে লুকিয়ে পড়লেন বাদশাহ। ওরা তাঁর শত্রু না মিত্র কে জানে। দেখতে দেখতে এই দ্বীপেই এসে নোঙর করল জাহাজটা। জনাদশেক লোক নামল। সবার হাতে মাটিকাটার কোদাল। এরা নিশ্চয়ই কারও ভাড়াকরা শ্রমিক। মনে হল বাদশাহ কালান্দরের। ওরা একটা জায়গা খুঁজে বের করল। তারপর গর্ত করতে লাগল। গাছের ডালে বসে সবই দেখতে লাগলেন বাদশাহ। লোকগুলো গর্ত খুঁড়তেই একটা গুপ্তঘরের দরজা পেয়ে গেল। তারপর আবার ফিরে এল জাহাজে। জাহাজ থেকে নানা রকম খাবার নিয়ে সেই গুপ্তঘরের ভিতরে রেখে আসতে লাগল। আরেক দফায় আনল কাপড় আর সাজপোশাক। আরও অনেক দামি জিনিশপত্র এনে রাখল ওই গুপ্তঘরে। মোটকথা একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের যে-সব দামি দামি জিনিশপত্র সবসময় প্রয়োজন সে-সব এনে রাখা হল সেখানে। তারপর জাহাজ থেকে নেমে এল এক থুত্থুড়ে বুড়ো। দেখে মনে হল তিনি কোনও দেশের রাজা। তাঁর হাত ধরে নামল একটি সুন্দর কিশোর।

পরনে তার মণিমুক্তো খচিত জামাকাপড়। এ নিশ্চয়ই তাহলে শাহজাদা? সবাই চলে গেল গুপ্তঘরের ভেতর। বেশ কিছুক্ষণ পর ঐ শাহজাদা ছাড়া আর সবাই বেরিয়ে এল। তারপর ঐ জাহাজে চড়ে সবাই চলে গেল দূরে কোথাও।

চোখের আড়ালে চলে গেল জাহাজটা। কালান্দর বাদশাহ নেমে এলেন গাছ থেকে। গুপ্তঘরের উপরের মাটি সরিয়ে দরজাটা খুলে ফেললেন তিনি। তারপর পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন নিচে। সুন্দর করে বানানো এই গুপ্ত বাড়িটা। চারপাশের দেয়ালে সুন্দর কারুকাজ। একটু এগোতেই দেখা গেল মখমলের পর্দা ঝোলানো একটা দরজা। পর্দা সরিয়ে ভেতরে যেতে একটু ভয় হল। মেঝেতে এত সুন্দর ঝকঝকে তকতকে গালিচা পাতা আছে যে পা রাখতে ইচ্ছে করে না। সুন্দর সুন্দর বসার আসন। মাথার ওপর হিরের কারুকাজ করা ঝাড়বাতি ঝুলছে। আলমারিতে রাখা আছে অনেক বই। টেবিলের উপরে একটা ফলের রেকাবি। মাঝখানে সুন্দর ফুলদানি। ঘরের এক কোণায় রাখা আছে একটা সোনার পালঙ্ক। পালঙ্কে শুয়ে আছে সেই কিশোর শাহজাদা। বাদশাহ কালান্দরকে দেখে ভয়ে আঁতকে উঠল শাহজাদা। বাদশাহ তাকে অভয় দিলেন।

'আমি তোমার শত্রু নই, বন্ধু। তোমার কোনও ক্ষতি করতে আসিনি বন্ধু। তোমাকে উদ্ধার করতেই এসেছি। দেখলাম ওরা তোমাকে এই পাতালপুরীতে বন্দি করে রেখে গেছে।' ভয় দূর হল ছেলেটির মন থেকে। হাসি ফুটল মুখে; আর যেন মণিমুক্তো ঝরে পড়ল। বলল,

'ওরা আমাকে বন্দি করে রেখে যায়নি। আমাকে বাঁচানোর জন্যই এই ব্যবস্থা। যে বৃদ্ধ লোকটিকে দেখেছেন তিনি আমার বাবা। আপনি হয়তো তাঁর নামও শুনে থাকবেন। জগদ্বিখ্যাত জহুরি তিনি। তাঁর মতো ধনী লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছে। পৃথিবীর প্রায় সব রাজা-বাদশাহর কাছে তিনি হিরে-জহরত বিক্রি করেছেন। তাঁর বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান আমি...।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল ছেলেটি। বলে চলল আবার—

'এক গণক আমার জন্মের সময় বলেছিলেন, এই শিশু তার পিতামাতার জীবদ্দশাতেই মারা যাবে। এর বয়স যখন পনের বছর হবে তখন বাদশাহ কাসিবের পুত্রের হাতে তার মৃত্যু ঘটবে। সেই গণক আরও অনেক বিস্তারিত আলামত বলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বাদশাহ কাসিবের পুত্র জাহাজডুবি হয়ে এক কষ্টিপাথরের পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠবে। সেখান থেকে পিতলের ঘোড়সওয়ারকে পানিতে ফেলে দিয়ে হাজার হাজার নাবিকের প্রাণ বাঁচাবে। আমার বাবা খুব সাবধানে এই পনের বছর আমাকে চোখে চোখে রেখেছেন। কিছুদিন হল খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে কাসিবের পুত্র সেই পিতলের ঘোড়সওয়ারকে সমুদ্রের পানিতে ফেলে দিয়েছে। এই খবর শোনার পর থেকে

আমার বাবা-মায়ের চোখে ঘুম নেই। গণকের ভবিষ্যদ্বাণী শোনার পর থেকেই আমাকে রক্ষা করার জন্য বাবা এই গুপ্ত প্রাসাদ বানিয়ে রেখেছিলেন। গণক বলেছিলেন, পিতলের ঘোড়সওয়ারকে ফেলে দেয়ার চল্লিশ দিনের মধ্যে এই ঘটনা ঘটবে। চল্লিশ দিনের জন্য তাই বাবা আমাকে এখানে রেখে গেছেন।' ছেলেটার কথা শুনে রাগ হল বাদশাহ কালান্দরের। এইসব গণকেরা যে কী ভণ্ড হয় তা তাঁর জানা আছে। নিরীহ মানুষের মনে ভয় ধরিয়ে এরা টাকা উপার্জন করে। তিনি ছেলেটাকে বললেন,

'কোনও ভয় নেই। আমি বেঁচে থাকতে কেউ তোমার একচুলও ক্ষতি করতে পারবে না। তোমার মতো এমন ভালো নিষ্পাপ একটা ছেলেকে আমি হত্যা করব একি হতে পারে? সব মিথ্যে কথা। সব বানানো গল্প।'

এরপর থেকে বাদশাহ কালান্দর ছেলেটাকে যত্ন করতে লাগলেন। খাবার সময় হলে আদর করে খাইয়ে দেন। মজার মজার গল্প শুনিয়ে আনন্দে মাতোয়ারা করে রাখেন তাকে। ছেলেটাও নির্ভয়ে থাকে। মাঝে মাঝেই এটা-সেটার জন্য আবদার করে। যদি আবদার না মেটানো হয় তাহলে অভিমান করে বসে। তাই বাদশাহ কালান্দর চেষ্টা করেন তার মনটাকে প্রফুল্ল রাখতে। ছেলেটার ওপর মায়া পড়ে গেছে তাঁর।

একদিন দুদিন করে পিতলের ঘোড়সওয়ারকে ফেলে দেবার উনচল্লিশ দিন পার হয়ে এল। এই দিনটা পার হলেই চল্লিশ দিন শেষ হবে। হিসেবমতো সেদিনই তার বাবার এসে নিয়ে যাবার কথা। তাই যত্ন করে বাদশা তাকে গোসল করিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে দিলেন। আতরের খুশবু মেখে দিলেন গায়ে। তারপর ছেলেটি খেতে বসবে। সামনে সুন্দর সুন্দর সব খাবার সাজানো আছে। কিন্তু সে তরমুজ খাবার বায়না ধরল।

বাদশাহ তার জন্য বড় দেখে একটা তরমুজ নিয়ে এলেন। পালঙ্কের ওপাশের দেয়ালে টাঙানো ছিল একটা ছুরি। তরমুজ কাটার জন্য ছুরিটা নামাতে হবে। ছুরিটা নামানোর জন্য পালঙ্কের উপর উঠে দাঁড়ালেন। ছুরিটা হাতে নিতেই হঠাৎ ছেলেটার মাথায় কী যেন হল, দুষ্টুমি করে কাতুকুতু দিয়ে বসল বাদশাহকে। বাদশাহ তখন ছুরিটা খোলার জন্য চেষ্টা করছেন। হয়তো ছুরি খোলার এই চেষ্টা করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হওয়ায় মজা পাচ্ছিল ছেলেটি। হঠাৎ এভাবে কাতুকুতু দিয়ে বসবে তাঁকে, ভাবতেও পারেননি বাদশাহ। চমকে উঠে পা-টা সরিয়ে নিতেই ভারসাম্য রক্ষা করতে না-পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন তিনি। আর পড়বি তো পড় পড়লেন ছেলেটার বুকের উপরে। তাঁর হাতে তখন খোলা ছুরি। সোজা গিয়ে বিঁধে গেল ছেলেটার বুকে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল ছেলেটার।

বুক ফেটে যেতে চাইল কালান্দর বাদশাহর। একেই বলে নিয়তি। না হলে যে ছেলেটার জন্য তাঁর এত মায়া-মমতা জন্মাল, যাকে আদর করে মন ভালো হয়ে গিয়েছিল; নির্জন দ্বীপে একা থাকার কষ্ট দূর হয়ে গিয়েছিল যে ছেলের কারণে সেই ছেলেটি কি-না গণকের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য করে দিয়ে তাঁরই হাতে মরল!

সারাজীবন কালান্দর বাদশাহকে এই দুঃখ বুকে নিয়ে বয়ে বেড়াতে হয়েছে। যখনই বৃদ্ধ জহুরির কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে ছেলেটার কথা তখন নীরবে পানি গড়িয়ে পড়ে কালান্দর বাদশাহর চোখ থেকে।

জাদুর ফুলদানি

দামাস্কাস শহরে বাস করত তিন বোন। সেই তিন বোনের বাবা ছিল এক তাঁতি; তাঁতির ছিল দুই বউ। বড় বউয়ের দুই মেয়ে আর ছোট বউয়ের এক মেয়ে। বড় বউয়ের মেয়েরা বয়সেও বড়। তিন বোনই খুব রূপবতী। তবে ছোটটির রূপের বুঝি তুলনাই মেলে না! তার বড় দুই বোনদের মন-ভরা শুধু হিংসা আর হিংসা। সারাক্ষণ তক্কে তক্কে থাকত কীভাবে ছোট বোনটাকে কষ্ট দেয়া যায়।

ছোট বোনটা সবার চেয়ে যেমন সুন্দর, মনটাও তেমনি পবিত্র। মানুষের দুঃখ-কষ্টে ভরে উঠত তার মন, ভুলে যেত নিজের দুঃখ। মন-ভরা শুধু ভালোবাসা আর ভালোবাসা।

তাঁতি আর তার বউয়েরা কিছুদিনের মধ্যেই মরে গেল। তিন বোনের দেখাশোনা করার জন্য আর কেউ রইল না। তিন বোনই হাতের কাজ জানত। কাপড় বানিয়ে সেগুলো বিক্রি করে দিন চালাতে লাগল তারা।

একদিন বাজার থেকে ছোট বোন একটা ছোট্ট ফুলদানি কিনে বাড়ি ফিরল। ফুলদানিটা ছোট হলেও দেখতে খুবই সুন্দর। ওটা দেখে দুই বোন আজেবাজে পয়সা খরচের জন্য খুব রাগারাগি আর গালমন্দ করল ছোট বোনকে। বকা শুনেও কিছু বলল না ছোট বোন। ফুলদানিটা আসলে ছিল জাদুর ফুলদানি। ফুলদানিটার সামনে দাঁড়িয়ে মজার মজার খাবার বা সুন্দর সাজপোশাক চাইলে সে সব এসে হাজির হয়। ছোট বোনটি ফুলদানির এই জাদুশক্তির কথা কাউকে বলেনি। প্রতিদিন গভীর রাতে যখন বড় বোনেরা ঘুমিয়ে পড়ত তখন সেই জাদুর ফুলদানি বের করত ছোট বোন। মজার মজার খাবার খেত। সুন্দর করে সাজত। যত দামি অলংকারই সে পেতে চাইত সব এই ফুলদানি তাকে এনে দিত।

রাতে ছোট বোন খুব সুন্দর করে সাজত। তখন কী যে অপরূপ লাগত তাকে! মনে হত গরিব তাঁতির ঘরে যেন জ্যোৎস্নার মায়াবী আলো নেমে এসেছে। ছোট বোনটির হাসি যেন হয়ে উঠত হিরে-মুক্তোর ঝলমলানি। কিন্তু এই সুন্দর রূপ আর কাউকে দেখাতে পারত না সে। কারও কাছে মন খুলে বলতে পারত না তার এই জাদুর ফুলদানিটার কথা।

একদিন বাদশাহর পাইক-বরকন্দাজরা দেশজুড়ে ঢোল বাজিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেল শাহজাদির বিয়ের খবর। শাহজাদির বিয়েতে সবার নিমন্ত্রণ। বড় দুইবোন সংবাদ শোনামাত্র নিমন্ত্রণ খেতে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারা একবারটি খোঁজ পর্যন্ত নিতে চাইল না ছোট বোনের। খুব মন খারাপ হল তার।

সন্ধেয় বড় বোনেরা ভালো ভালো কাপড় আর গয়না পরল। খুব করে সেজেগুজে গেল বাদশাহর মহলে। শাহজাদির বিয়ে দেখার জন্য তাদের সে কী ব্যাকুলতা!

আর ছোট বোন? সে বাড়িতে রইল একা। অনেকক্ষণ পর ছোট বোন জাদুর ফুলদানির কাছে চাইল দামি পোশাক আর গয়না। সাজগোজ শেষ হবার পর তাকে খুব সুন্দর লাগল। মনে হল বেহেশত থেকে যেন হুর-পরী নেমে এসেছে। ছোট বোনটি বাদশার প্রাসাদে এসে পৌঁছলে যেন সারা প্রাসাদ ঝলমল করে উঠল। সবাই বলাবলি করল, নিশ্চয়ই সে কোনও দেশের শাহজাদি। বিয়ে উপলক্ষে সেখানে চলছিল গান-নাচ-বাদ্য আর আনন্দ-ফুর্তি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার আগেই তড়িঘড়ি চুপিসারে ঘরে ফিরে এল ছোট বোন। বড় বোনদের আগে ঘরে ফিরতে হবে। না হলে তো ফুলদানির রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। সাজ-পোশাকও আবার ফুলদানিকে বুঝিয়ে দিতে হবে। বড় বোনেরা চলে আসার আগে সব কিছু করতে হবে। খুলে রাখতে গিয়ে ছোট বোন দেখল তার বাঁ পায়ের মল নেই। এই অন্ধকারে এখন মল কোথায় পাবে? খুঁজতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। কী আর করা! বাঁ পায়ের মল ছাড়াই সবকিছু ফিরিয়ে দিল ফুলদানির কাছে। জাদুর ফুলদানির কাছে মাফ চেয়ে নিল।

পরের দিন। প্রতিদিনের মতো ভোরবেলা শাহজাদা বেরুবে প্রাতঃভ্রমণে, ঘোড়ার পিঠে চেপে ঘুরতে খুব ভালোবাসেন তিনি। ঘোড়ায় চড়ার জন্য আস্তাবলে এলেন। দেখলেন সব সহিস মিলে জটলা পাকিয়ে আছে। কী যেন একটা নিয়ে কথা বলাবলি করছে। শাহজাদাকে দেখে সরে গেল সবাই। একজনের হাতে তিনি দেখতে পেলেন একটা অলংকার।

লোকটা জানাল এ অলংকার সে এখানে কুড়িয়ে পেয়েছে। শাহজাদা অলংকারটা দেখে বুঝতে পারলেন এটা নিশ্চয়ই কোনও শাহজাদির পায়ের মল। হিরের তারা বসানো অলংকারটি যেমন দামি তেমনি সুন্দর এর নকশার ধরন। শাহজাদা মনে মনে ভাবলেন এই মল যার পায়ে ছিল না জানি সে কত সুন্দর!

ওই মল পাবার পর থেকে শাহজাদা শুধু চুপচাপ বসে থাকেন। মলটা যার পায়ে পরা ছিল শুধু তার রূপের কথা ভাবেন। দিন দিন শাহজাদা আত্মভোলা হয়ে পড়তে লাগলেন। বাদশাহর নজরে এল ব্যাপারটা। ছেলের মনের কথা ভেবে বাদশাহ তাঁর পাইক-বরকন্দাজদের ডাকলেন। ওই মল যার পায়ের শোভা সেই মেয়েটিকে খুঁজে আনতেই হবে। নিশ্চয়ই শাহজাদির বিয়ের সময় বেড়াতে-আসা কোনও শাহজাদির পা থেকে খুলে পড়েছিল এই মল।

পাইক-বরকন্দাজ, সান্ত্রি-সিপাই অনেক খুঁজেও সেই মল-এর মালকিনকে খুঁজে পেল না। সিপাই-সান্ত্রিরা ফিরে এসে সংবাদ দেয় মল-এর মালকিনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আরও মন খারাপ হতে থাকে শাহজাদার। এসব দেখে শাহজাদার মা বাদশাহকে বললেন, দেশের প্রতিটি ঘরে রাজার গুপ্তচর পাঠিয়ে দিন। খুঁজে বের করতেই হবে মেয়েটিকে। বাদশাহ সায় দিলেন বেগমের কথায়।

যেই বলা সেই কাজ। গুপ্তচরেরা ঘরে ঘরে গিয়ে খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে কয়েকজন গুপ্তচর এসে হাজির তিন বোনের বাড়িতে। তিন বোনের পা দেখে গুপ্তচরেরা বুঝতে পারল সেই মল ছোট মেয়েটির পায়েরই হবে। তারা জেরা শুরু করল তিন বোনকে। প্রথমে আমতা আমতা করে অস্বীকার করল। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল ছোট বোন।

আর কী! ধুমধাম শুরু হল দেশময়। সাজ সাজ রব পড়ে গেল চারদিকে। বাদ্যি বাজল বাদশাহর প্রাসাদে। বিয়ে হয়ে গেল শাহজাদার সঙ্গে ছোট বোনের। হিংসায় জ্বলে মরতে লাগল বড় দুই বোন। কিন্তু ছোট বোন তো লক্ষ্মী মেয়ে, সুন্দর মনের মানুষ। প্রাসাদে যাবার সময় বোনদেরও ডেকে নিতে ভুলল না।

চল্লিশ দিন ধরে চলল শাহজাদা আর ছোট বোনের বিয়ের আনন্দ। এই আনন্দের সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ছোট বোনটা ভাবল, তার তো আর কোনও দুঃখ নেই, নেই কোনও কিছুর অভাব। তাহলে এই জাদুর ফুলদানি দিয়ে কী হবে আর? বোনেরা গরিব। ফুলদানিটা তাদের দিয়ে দিলে কেমন হয়? যেই ভাবা সেই কাজ। ফুলদানিটা তো বোনদের দিলই, সেই সঙ্গে ফুলদানির গুপ্ত রহস্যও বলে দিল।

একদিন। ছোট বোন অনেকক্ষণ ধরে গোসল করল। তারপর সাজতে বসল বড় বোনদের সঙ্গে। বড় বোনেরা যত্ন করে, পরিপাটি করে সাজাতে লাগল তাকে। বোনেরা তার মাথায় একটা ঝুঁটি বেঁধে দিল। এক এক করে আটটা চুলের কাঁটা গেঁথে দিল সেই ঝুঁটিতে। যেই না শেষ কাঁটাটা ঝুঁটিতে গাঁথা হয়ে গেল, অমনি একটা ছোট্ট বুলবুলি হয়ে গেল ছোট বোন। বড় বোনেরা হুশ হুশ করে তাড়িয়ে দিল বুলবুলি পাখিটাকে। তারপর তার প্রাসাদ থেকে নিজেদের বাড়িতে ফিরে এল হিংসুটে বড় বোনেরা।

সারাদিন কাজের শেষে ঘরে ফিরে এসে সেই ছোট বোনটিকে খুঁজে পেল না শাহজাদা। সারা প্রাসাদ তন্ন তন্ন করে খুঁজল। পাওয়া গেল না তাকে। হিংসুটে বড় বোনেরা প্রাসাদে এসে আবার ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নাকাটি করতে লাগল। কেন যে ছোট বোনটা শাহজাদার বউ হতে গেল, তাই তো আজ তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

শাহজাদা তো রোজ খুঁজতে বের হন ছোট বোনটাকে। ক্লান্ত হয়ে সন্ধেবেলা ঘরে ফেরেন। চুপচাপ বসে থাকেন মনমরা হয়ে। হঠাৎ একদিন লক্ষ করলেন একটা ছোট্ট বুলবুলি পাখি কিচির মিচির করে কী যেন বলছে। মানুষ তো আর পাখির ভাষা বোঝে না! শাহজাদা বুঝবেন কী করে! অসীম মমতায় হাত বাড়িয়ে ধরলেন পাখিটাকে। কিন্তু হাত বাড়িয়ে ধরতে যাবার পরও উড়ে গেল না পাখিটা। যেন গুটিসুটি মেরে শাহজাদার বুকের কাছে এগিয়ে এল। শাহজাদা প্রতিদিন বুলবুলিকে খাবার দেন, আদর করেন। বুলবুলি পাখিটাও সারাক্ষণ শাহজাদার কাছেই থাকে।

একদিন। হঠাৎ শাহজাদা দেখলেন বুলবুলির ঝুঁটিতে চুলের কাঁটার মতো কী যেন আটকে আছে কয়েকটা। কী যেন ভেবে সে একটা কাঁটা ধরে একটু টান দিতেই খুলে এল কাঁটাটা। বুলবুলিও যেন খুশি হল। শাহাজাদা এরপর একে একে আটটা কাঁটাই খুলে নিলেন ঝুঁটি থেকে। শেষ কাঁটাটা খুলে ফেলতেই সেই ছোট্ট বুলবুলি হয়ে গেল তিন বোনের সেই ছোট বোনটি।

শাহজাদার আনন্দ আর দেখে কে? যেন হারিয়ে যাওয়া চাঁদটাকে খুঁজে পেয়েছেন ফের। কত যে আনন্দ করলেন শাহজাদা!

ছোট বোনের মন এতই ভালো যে সব বুঝেও বড় বোনদের এই অন্যায়ের কথা শাহজাদাকে বলে দেয়নি। অথচ বড় বোনেরা জাদুর ফুলদানির কাছ থেকে জাদুর কাঁটা চেয়ে নিয়ে ছোট বোনকে পাখি বানিয়ে রেখেছিল। যার মন সুন্দর, মহৎ সে তো এমনই করবে; সে ক্ষমা করবে মানুষকে। যার মন কুৎসিৎ সে কোনও-না-কোনও ভাবে শাস্তি পেয়ে যাবে। ছোট বোন শাস্তি না দিলেও তিল তিল করে শাস্তি পেয়েছিল ওরা সারাজীবন।

এরপর থেকে ছোট বোনের জীবন কেটে যাচ্ছিল অনেক সুখে আর আনন্দে...।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

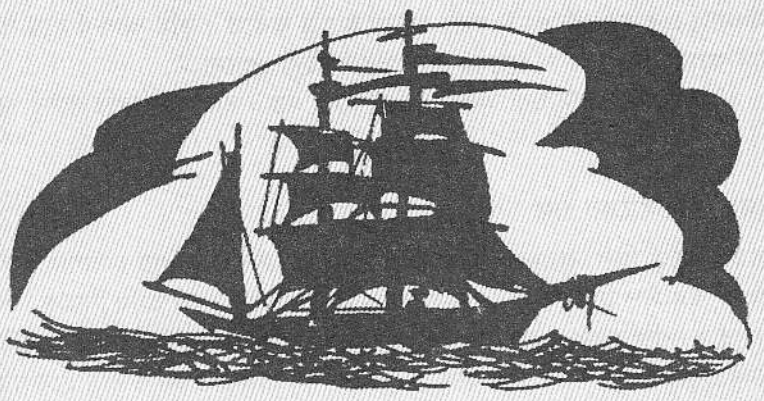

সিন্দাবাদের সাত অভিযান

বাগদাদ শহরে এক বিশাল বাড়ি। চলছে উৎসব। খুশবু-আতরের গন্ধে খানা-পিনা। কত অতিথি কত মেহমান। এই বাড়ির মালিকের নাম সিন্দাবাদ। হাসি ঠাট্টায় মশগুল তিনি। আপ্যায়ন করছেন অতিথিদের। খোঁজ খবর নিচ্ছেন।

সেই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল এক দীনহীন কুলি। সারাদিনের ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত চেহারা তার। ঘাম ঝরছে দরদর করে। ক্ষুধায়, পিপাসায় বড় কাতর সে। বাড়ির সামনে এসে ধপ করে বসে পড়ল। গরিবের কত দুঃখ।

ভেতর থেকে সিন্দাবাদ গরিব কুলিকে দেখলেন। প্রহরী পাঠালেন। যাও ওকে ডেকে আনো। গরিব কুলি ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। কী সুন্দর ঘরের আসবাবপত্র। দামি দামি সব জিনিশ। চমৎকার ফুলের বাগান। তার মধ্যে সাজানো-গোছানো ঘর।

সিন্দাবাদ বললেন, 'হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হও। তারপর তোমার সাথে আলাপ হবে।' গরিব কুলি খাওয়া-দাওয়া করল। এমন খাবার সে জীবনে কখনও খায়নি।

এরপর তাকে সিন্দাবাদ নিজের ঘরে নিয়ে এলেন।

'কী নাম তোমার? কী কর?'

'আমার নাম সিন্দাবাদ। কুলিগিরি করি আমি!' হো হো করে হেসে উঠলেন সিন্দাবাদ।

'তুমি তো আমার মিতা হে। এস আমরা হাত মিলাই।'

খানাপিনা শেষ হবার পর সিন্দাবাদ বললেন,

'আজকে যে অবস্থায় তুমি দেখতে পাচ্ছ একদিন আমার এ অবস্থা ছিল না। বড় বিচিত্র আমার জীবন কাহিনী। কত উত্থানপতন। কত দুঃখকষ্ট। কত হতাশা

বেদনা। একমাত্র পরিশ্রমই পারে মানুষকে বড় করতে। তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে যদি আমার জীবনের পরিশ্রমের সেই সব কাহিনী শোনো।'

এই বলে সিন্দাবাদ শুরু করল তার জীবনের গল্প। তার সমুদ্র অভিযানের গল্প।

প্রথম অভিযানের গল্প

আমার বাড়ি ছিল বাগদাদে। বাবা ছিলেন একজন সওদাগর। অগাধ টাকা-পয়সা, ধন-সম্পত্তি ছিল তাঁর। বাবা যখন মারা গেলেন তখন আমি নিতান্ত শিশু। বাবার সম্পত্তি হাতে পেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল আমার। বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে টাকা ওড়াতে লাগলাম। বসে বসে খেলে একদিন রাজভাণ্ডারও উজাড় হয়ে যায়। টাকা-পয়সা ফুরিয়ে গেলে আমার বুদ্ধি উদয় হল। বাণিজ্যে বেরুতে হবে। কিছু মালপত্র কিনে বন্দরে গেলাম। জাহাজে চেপে রওয়ানা দিলাম ছোট বড় সওদাগরদের সাথে।

জাহাজ চলল। উত্তাল নীল জলরাশি। আকাশ মিশে গেছে সাগরের সঙ্গে। চারিদিকে ধু ধু অনন্ত শূন্য।

কয়েকমাস পর। শূন্য শ্যামল এক দ্বীপে এসে জাহাজ নোঙর করল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে যেন বাঁচলাম। একাধারে জাহাজে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছি। দ্বীপে নেমেই গোসল করলাম। কেউ কেউ গাছতলায় শুয়ে-বসে বিশ্রাম করতে লাগল। কাঠ যোগাড় করে রান্নাবাড়ার ব্যবস্থা করতে গেল কেউ কেউ।

এমন সময় কেঁপে উঠল দ্বীপটা। যেন পানির তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। জাহাজের কাপ্তেন চিৎকার করে জানাল,

'শিগগির জাহাজে ফিরে এস। ওটা দ্বীপ নয়। মস্ত একটা তিমি মাছ। ফিরে এস সবাই।'

আশেপাশের লোকেরা দ্রুত ফিরে গেল জাহাজে। আমরা উঠতে যাব এমন সময় ভুশ করে তিমিটা দিল ডুব। ছিটকে পড়লাম সাগরের পানিতে। জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য! হাতের সামনেই পেলাম একটা কাঠের গুঁড়ি। গুঁড়িটা ধরে কোনও মতে ভেসে রইলাম। ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে গেল আমার জাহাজটা। মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

সাগরের বুকে ধীরে ধীরে নেমে এল সন্ধ্যা। রাত্রি গাঢ় হল। ভাসতে ভাসতে কোথায় চললাম কে জানে। ভোর হল। সূর্য উঠল আকাশে। ছায়ার মতো তীরের রেখা দেখতে পাচ্ছি। তীর নয়—খাড়া এক পাথরের দেয়াল। সমুদ্রের মাঝখান থেকে উঠে গেছে এক পাহাড়। কী করে এই পাহাড়ের উপর উঠব? দু-একবার চেষ্টা করলাম। হাত-পা ছড়ে গেল।

একখানে একটু সমান জায়গা রয়েছে। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম সেখানেই। সকালে দেখি মাথার সামনে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে এক ঝরনা। ফুলের সুবাস আসছে। কয়েকটা ফলের গাছও চোখে পড়ল। ফল খেয়ে ঝরনার পানি পান করতেই চাঙ্গা হয়ে উঠল শরীরটা। ঝরনাধারার পথ বেয়ে হাঁটা ধরলাম সামনে।

হাঁটতে হাঁটতে টের পেলাম—আমি এসে পড়েছি সমুদ্রের ধারে। জায়গাটা খুব সুন্দর। কিন্তু কোনও জনমানুষের সাড়া নেই। দেখতে পেলাম—একটা গাছের ডালে বাঁধা রয়েছে একটা তাগড়া ঘোড়া। ঘোড়া দেখে তো আমার চক্ষু ছানাবড়া। লাফ মেরে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলাম।

তখুনি চিৎকার আর চেঁচামেচি। ছুটে এল একটা লম্বা-চওড়া লোক—'কে তুমি? এত দুঃসাহস তোমার! কোত্থেকে এসেছ তুমি?' দুঃখে কাতর হয়ে সব ঘটনা বললাম লোকটিকে। লোকটির মনে যেন দয়া হল। সে নিয়ে গেল তার গুহায়। ভালো ভালো খাবার দিল। বলল—তাদের সুলতানের নাম মিরজান। মিরজানের সৈন্যবাহিনীর ঘোড়া প্রতিপালন করাই তার কাজ।

আমি সুলতান মিরজানের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। সুলতান বড় ভালো মানুষ। খুশি হলেন আমার দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী শুনে। আমাকে বন্দরের প্রধান করে দিলেন।

বেশ ভালো হল আমার। দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝেই মন হু হু করে কেঁদে উঠত বাগদাদের কথা মনে পড়লে। বন্ধুদের কথা ভাবলেই ভারি কান্না পেত! বন্দরে বসে বসে দূর সমুদ্রের পানে তাকিয়ে থাকতাম। আহা, বাগদাদে যাওয়ার কোনও জাহাজ যদি এসে ভিড়ত!

দেখতে দেখতে কত দিন কেটে গেল কে জানে! একদিন এক জাহাজ এসে নোঙর করল বন্দরে। কী কী মালপত্র রয়েছে পরীক্ষা করার জন্য জাহাজে উঠলাম। কাপ্তেন বলল, আমার জাহাজে কিছু মাল রয়েছে অন্য সওদাগরের। সেই সওদাগরকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে তার মালপত্র পৌঁছে দেব তার ওয়ারিশদের। কেমন শিরশির করতে লাগল বুকটা আমার। সেই সওদাগরের নাম কী তোমরা জান—

'হ্যাঁ—তার নাম সিন্দাবাদ।'

চমকে উঠলাম আমি। আত্মহারা হয়ে গেলাম আমি আনন্দে। আমিই, 'আমিই সেই সিন্দাবাদ। দ্বীপ ভেবে উঠেছিলাম তিমির পিঠে। তিমি ডুবে গেলে ছিটকে পড়ে যাই সাগরের পানিতে। আল্লার দয়ায় বেঁচে গেছি আমি।'

জাহাজের কাপ্তেন আমার কথা বিশ্বাসই করতে চান না। খালাসি আর নাবিকরা আমাকে চিনে ফেলল। আমার খুশি আর তখন দেখে কে! খোলা হল

আমার মালপত্র। সুলতানকে মূল্যবান কয়েকটি উপহার-সামগ্রী পাঠালাম। কিছু জিনিশ বিক্রি করে লাভও হল বেশ। সুলতান মিরজানও অমূল্য কিছু অলঙ্কার উপহার দিলেন আমাকে। সবচেয়ে বড় কথা, বিশাল ধন-সম্পদের অধিকারী হলাম আমি। ব্যবসাও বেশ জমে উঠল। তারপর একদিন রওনা দিলাম নিজের দেশে। জন্মভূমিতে। আমাকে ফিরে পেয়ে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আবার ফিরে পেলাম সুখের দিন। আবার ওড়াতে লাগলাম টাকা-পয়সা।

নাবিক সিন্দাবাদের কাহিনী শুনে অবাক হয়ে গেল কুলি সিন্দাবাদ। নাবিক সিন্দাবাদ তাকে একশো সোনার মোহর উপহার দিল।

'আবার এস। আগামীকাল শোনাব আমার দ্বিতীয় অভিযানের গল্প।'

দ্বিতীয় অভিযানের গল্প

পরদিন। কুলি সিন্দাবাদ ছুটে এল সেই বিশাল বাড়িতে। নাবিক সিন্দাবাদ তখন খেতে বসেছেন। গায়ে তাঁর আলখাল্লা। মাথায় পাগড়ি। ধপধপে একমুখ দাড়ি। কুলি সিন্দাবাদকে পাশে নিয়ে বসালেন। রকমারি ফলমূল আদর করে খাওয়ালেন তাকে।

তারপর শুরু করলেন তাঁর দ্বিতীয় সমুদ্র অভিযানের রোমাঞ্চকর গল্প।

প্রথমবার বাণিজ্য করে ফিরে এলাম মৃত্যুর দুয়ার থেকে। অবশ্য টাকা-পয়সা আয় হয়েছিল যথেষ্ট। বছরখানেক বেশ নিশ্চিন্ত মনে খরচাপাতি করলাম। আনন্দে-ফুর্তিতে কাটতে লাগল দিনগুলো। কিন্তু রক্তে রয়েছে আমার সুদূরের টান। অজানাকে জানার নেশা। দুর্জয়কে জয় করার ইচ্ছে।

আবার লটবহর গোছালাম। মাল-সামান কিনে বাক্স বাঁধলাম। প্রস্তুত হলাম। এবার নিজের কেনা জাহাজেই রওনা দেব। সাজালাম বাণিজ্যতরী। মাস্তুলে উড়িয়ে দিলাম লাল-নীল পতাকা। নামি ও সাহসী এক কাপ্তেন নিলাম। দক্ষ মাঝি, দক্ষ মাল্লা রইল।

চলল আমাদের জাহাজ। এ-দেশ থেকে ও-দেশ। দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তর। বাজার গঞ্জে চলছে জিনিসপাতির কেনাবেচা। এইভাবে একদিন সুন্দর এক দ্বীপে এসে নোঙর করলাম। অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। সবুজের সমারোহ চারপাশে। গাছের ফল আর ঝরনার জল খেয়ে জুড়িয়ে গেল প্রাণ। মধুর বাতাস বইছে। কী এক ভালো লাগার আবেশে বুজে এল দুই চোখ। নেশায় বিভোর হয়ে কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না।

ফিরে এসে দেখি, জাহাজ নেই। কী ব্যাপার! আমাকে ফেলেই জাহাজ চলে গেছে। শরীর হিম হয়ে এল আমার। এই নিরালা দ্বীপে এখন কী করব আমি, কোথায় যাব? এ কী কঠিন পরীক্ষা আমার? বেশ তো সুখেই ছিলাম। কেন আবার লোভ হল আমার? হায় হায়—এখন আমি কী করব। কিন্তু হতাশায় ভেঙে পড়লে চলবে না। বিপদের সময় সাহসে বুক বেঁধে দাঁড়াতে হবে।

উঁচু এক গাছের মগডালে চেপে দেখে নিলাম দ্বীপটাকে। দেখি দূরে একটা গম্বুজের মতো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই গম্বুজে প্রবেশের কোনো পথ নেই।

হঠাৎ দেখি—চারিদিকে ঘন অন্ধকার নেমে এল। ঝড়ের কালো মেঘের মতো কী যেন ঢেকে ফেলল আকাশটাকে। বুঝলাম, রাত্রি নামেনি। আকাশেও মেঘ জমেনি। এ হচ্ছে রক্ পাখি। দেখতে এরা ছোটখাট পাহাড়ের মতো। গম্বুজটা আসলে হচ্ছে রকপাখির ডিম। পাখা গুটিয়ে পাখিটা ডিমের ওপরে বসল। তড়িৎ আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। মাথার পাগড়ি খুলে পাখির সাথে নিজেকে বেঁধে নিলাম।

যেই পাখি আকাশে উঠল অমনি আমিও চললাম। উঁচু—উঁচু—অনেক উঁচুতে। পাখিটা নামল গিয়ে একটা পাহাড়ের পাথুরে চূড়ায়। বাঁধন আলগা করে সেখানেই নেমে পড়লাম আমি। কিন্তু হায়! কোথায় এলাম? চারপাশে ভয়ঙ্কর সব সাপ কিলবিল করছে। বিপজ্জনক উপর থেকে বুঝেশুনে নেমে এলাম উপত্যকায়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। কী আশ্চর্য! পায়ের দিকে তাকাতেই দেখি অসংখ্য হাড়ের টুকরো। বিচিত্র বর্ণবাহার। ভয়াল সাপগুলো পালিয়ে যাচ্ছে যে যার গর্তে। রকপাখির আক্রমণের ভয়ে। সারাদিন ঘুরে বেড়ালাম আশ্রয়ের সন্ধানে। খিদেয় কাতর আমি। প্রায় মরো মরো অবস্থা। সন্ধ্যার সময় একটা নিরাপদ গুহা খুঁজে পেলাম। পাথর দিয়ে গুহার মুখ আটকে দিতেই ভেতরে দেখি একটা সাপ। কুণ্ডলি পাকিয়ে ডিমে তা দিচ্ছে। দেখেই হিম হয়ে গেলাম আমি। তারপর জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরল সকালে।

অনাহারে শরীর যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে আমার। কোনওমতে টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এলাম। চারপাশে পড়ে আছে মাংসের খণ্ড। ব্যাপারটা কী? অবাক হলাম। আসলে মাংসখণ্ড দিয়ে হিরে সংগ্রহ করে জহুরিরা। কাঁচা মাংসের গায়ে হিরের কিছু টুকরো গেঁথে যায়। বাজপাখিরা এসে ছোঁ মেরে মাংসের খণ্ডটাকে তুলে নিয়ে যায় নিজের বাসায়। জহুরিরা সেখান থেকে হিরের টুকরো সন্ধান করে।

মাথায় বিদ্যুতের মতো বুদ্ধি খেলে গেল। কিছু বড় বড় হিরে কোমরে বেঁধে নিলাম। তারপর একখণ্ড বড় মাংসপিণ্ডের সঙ্গে নিজেকে শক্ত করে বাঁধলাম। পাথরের ওপর উঁচু হয়ে শুয়ে রইলাম চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরেই শোঁ শোঁ করে নেমে এল বিশাল এক বাজপাখি। মাংস ভেবে ছোঁ মেরে তুলে নিল আমাকে। পাখির সঙ্গে উড়ে উড়ে আমিও চললাম। গিয়ে নামলাম আস্তানায়।

একটু পরেই সেখানে এল এক বুড়ো জহুরি। আমাকে দেখে তো সে অবাক! মানুষের মুখ দেখে ভারি আনন্দ হল আমার। লাফাতে লাফাতে আমি তার কাছে গেলাম। কিন্তু বুড়ো আমাকে দেখে খুশি হয়েছে বলে মনে হল না। চটেমটে সে বলল, 'তুমি কে? কোত্থেকে তোমার আগমন। হিরের ভাগ কিন্তু তুমি পাবে না। এ আমার বংশগত অধিকার।'

আমি তখন হো হো করে হেসে ফেললাম।

'আপনি ভুল করছেন। আমি ভাগ বসাতে আসিনি। আমি একজন সওদাগর। ভাগ্যের ফেরে আজ আমার এই দশা। আমি জানে বাঁচতে চাই।'

বলেই বড় বড় হিরেগুলো আমি বুড়োকে দিলাম। লোভে চকচক করে উঠল বুড়োর চোখ।

'জন্মেও তো এ-রকম হিরের টুকরো আমি পাইনি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ তোমাকে। বল, তোমার কী বিত্তান্ত? কোত্থেকে তুমি এলে এখানে? হিরের টুকরোই-বা সংগ্রহ করলে কীভাবে?'

জহুরিকে তারপর সব কথা বললাম।

বুড়ো জহুরি জানাল, 'আজ পর্যন্ত ঐ পাহাড় থেকে কেউ বেঁচে ফিরতে পারেনি। তোমার সাহস আছে বটে। স্রেফ ভাগ্যের জোরেই তুমি বেঁচে এসেছ।'

বুড়োর সঙ্গে গেলাম ওদের তাঁবুতে। ভরপুর খাওয়া-দাওয়া করে ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিলাম বিছানায়। সকালে ঘুম ভাঙতেই বুঝলাম, দেহমন বেশ ঝরঝরে। বুড়োর সঙ্গেই এলাম সমুদ্রের ধারে। একটা সদাগরি জাহাজে চেপে এলাম কর্পূরদ্বীপে। হিরে বিক্রি করে সোনার মুদ্রা সংগ্রহ করলাম। কর্পূর-দ্বীপে রয়েছে একধরনের গাছ। এই গাছের রস থেকে কর্পূর পাওয়া যায়। অবশ্য এখানে এসে ভয়ঙ্কর এক জানোয়ারের সাক্ষাৎ পাই। নাম এদের কারকাডন। দেখতে অনেকটা গণ্ডারের মতো। বড় বড় হাতিকে পর্যন্ত এরা অনায়াসে মেরে ফেলতে পারে। জাহাজে চেপে আবার রওনা দিলাম অন্য দ্বীপের উদ্দেশ্যে। এই বন্দর থেকে সেই বন্দর। এই দেশ থেকে অন্য দেশ।

তারপর একদিন বাণিজ্যতরী এসে ভিড়ল বাগদাদে। বহুদিন বাদে জন্মভূমিতে এসে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম আমি। খুশিতে মেতে উঠলাম আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে। হৈ-হল্লা করে আনন্দেই দিন কাটতে লাগল আমার।

আগামীকাল দেখি, তোমাকে তৃতীয় সমুদ্র অভিযানের গল্প শোনাব। সে-ও জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কুলি সিন্দাবাদ আজও একশ সোনার মোহর নিয়ে বিদায় নিল।

নাবিক সিন্দাবাদ ভাবতে লাগলেন, তৃতীয়বারের অভিযানের দুঃসাহসিক গল্প।

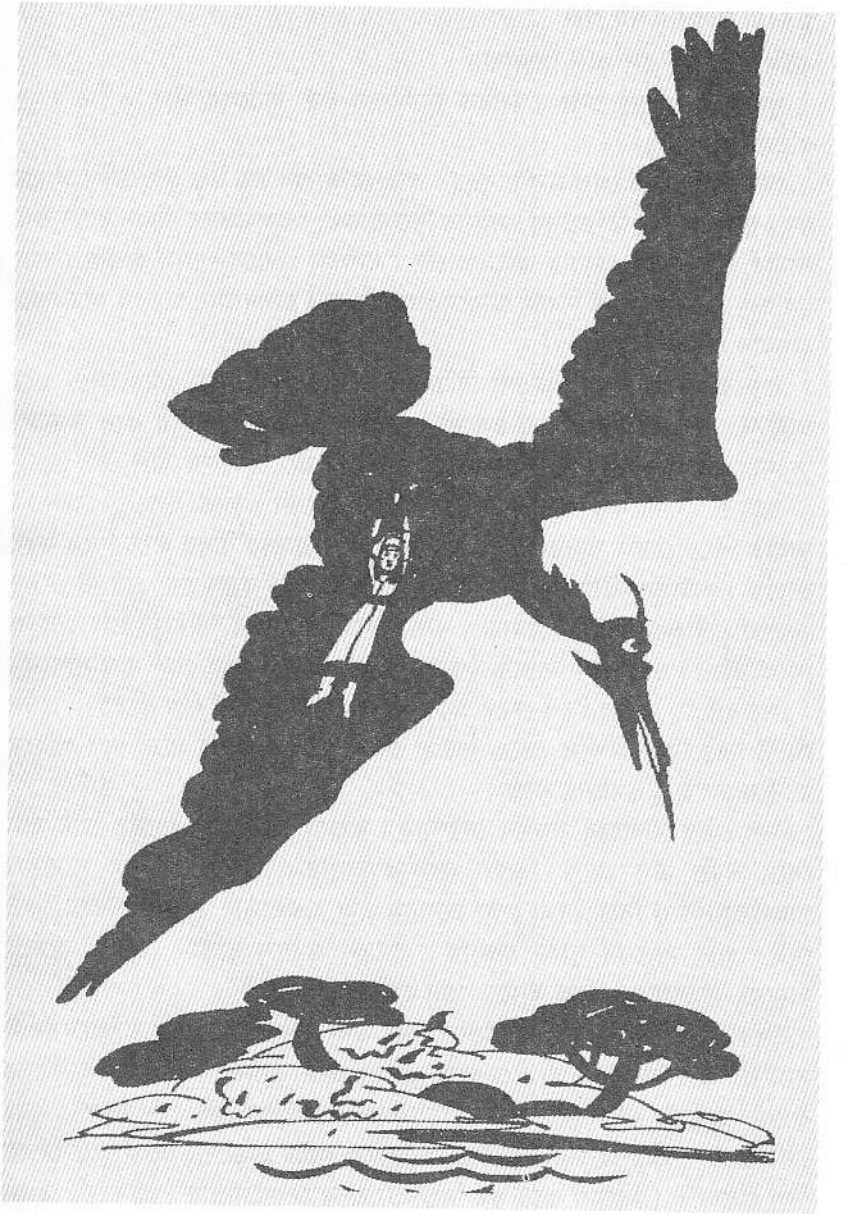

তৃতীয় অভিযানের গল্প

পরদিন আবার এল কুলি সিন্দাবাদ।

ধুমসে খানাপিনা চলল। নাবিক সিন্দাবাদ শুরু করলেন তাঁর তৃতীয় সমুদ্র অভিযানের গল্প।

আনন্দেই কেটে গেল একটা বছর। তারপর আবার উড়ু উড়ু হয়ে উঠল আমার মন। ভুলে গেলাম বিপজ্জনক সেইসব দিনের কথা। অলসভাবে জীবন ধারণ করা আমার রক্তে নেই। আবার জাহাজে চেপে বসলাম। পালে লাগল হাওয়া। যাত্রা হল শুরু। এবারে সঙ্গে নিলাম আরবের আতর আর বাগদাদের হাতের কাজ-করা মূল্যবান শৌখিন সামগ্রী।

বন্দরে বন্দরে নামি। সওদা বিক্রি করি। প্রচুর লাভ হয়। মন নেচে ওঠে আনন্দে। জাহাজ চলছে তো চলছেই। একদিন কাপ্তেন চিৎকার করে জানাল: 'সর্বনাশ! আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। সামনেই রয়েছে বাঁদর-দ্বীপ।'

জাহাজ ঘোরানোর অনেক চেষ্টা করলেন কাপ্তেন। লাভ হল না কোনও। জাহাজ গিয়ে ঠেকল বাঁদর-দ্বীপের চরায়। হাজার হাজার বাঁদর এসে ঘিরে ধরল জাহাজ। পাটাতনে উঠে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে অসভ্যতা শুরু করল ওরা। বিকট ওদের চিৎকার। বীভৎস ওদের চেহারা। ধাক্কা দিয়ে আমাদের নামিয়ে দিল জাহাজ থেকে তীরে। ওরা তখন নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে চলে গেল মাঝ সাগরে।

সব হারিয়ে অকূল দ্বীপে নেমে অনেকেই তখন কান্নাকাটি শুরু করেছে। এখন কী উপায়? কিন্তু বিপদে ভেঙে পড়লে চলবে না। অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে মানিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

দল বেঁধে খাবারের সন্ধানে বেরুলাম। ঝরনার জল আর গাছের মিষ্টি ফল খেয়ে শান্তি এল প্রাণে। এখন দরকার আশ্রয়। এগিয়ে চললাম সামনে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল মনোরম এক রাজপ্রাসাদ। কিন্তু ভেতরে কেউ নেই। পচা মাংসের দুর্গন্ধ পেলাম। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মানুষের হাড়গোড়। ভয়ে আমরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

বিকট শব্দে জ্ঞান ফেরে আমাদের। সূর্য তখন ডুবতে বসেছে। তাকিয়ে দেখি সামনেই এক বিরাট দৈত্য। দেখতে কুৎসিৎ এবং ভয়াবহ। প্রথমেই আমাদের কাপ্তেনের মুণ্ডুটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল সে। কারণ কাপ্তেন ছিল বেশ তাগড়া এবং মোটাসোটা। তারপর পরম তৃপ্তিতে কাপ্তেনকে খেয়ে হাড়গোড়গুলো ছুড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। আয়েশ করে ঘুম দিল প্রাসাদের দোরগোড়ায়। আমাদের তখন কী অবস্থা তা না বলাই ভালো। রাত কাটল কোনওমতে। সকালে দৈত্যটা চলে গেল আপন কাজে। সকালে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু কোথাও আশ্রয় না

পেয়ে বাঁদরের উৎপাতে আবার ফিরে এলাম সেই প্রাসাদে। পরদিনও ঘটল সেই একই ব্যাপার। আরেকজনের মুণ্ডু চিবিয়ে খেল সেই দৈত্য।

এরপর আমি সবাইকে বললাম, মরতে যদি হয় তবে এইভাবে নয়। সারাদিন কষ্ট করে সবাই মিলে একটা ভেলা বানালাম। চুলোয় আগুন জ্বালিয়ে লোহার শিক গরম করলাম।

সন্ধ্যায় এলাম সেই ভৌতিক দৈত্যপুরীতে। আবার একজনের প্রাণ গেল। ঢেঁকুর তুলে ঘুমাল সেই দৈত্য। আমরা এবার গরম লোহার শিক গেঁথে দিলাম দৈত্যের চোখে। ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে উঠল দৈত্যটা। কিন্তু চোখে সে দেখতে পারল না কাউকে। আমরাও প্রাণভয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে পালিয়ে গেলাম। চেপে বসলাম তৈরি করা ভেলায়। দৈত্যটা পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে এল তীরে। প্রচণ্ড বেগে পাথর ছুড়ে মারতে লাগল ভেলা লক্ষ্য করে। পাথরের আঘাতে দু-একজন মারাও গেল আমাদের মধ্যে।

একটানা দুইদিন দুইরাত্রি চললাম আমরা। অজানা আরেক দ্বীপে এসে আমাদের ভেলা ভিড়ল। সারা দ্বীপ জুড়ে রয়েছে বিরাট বিরাট সাপ। বিশাল হাঁ করে গোটা মানুষটাকে গিলে ফেলে তারা। বিপদের পরে বিপদ। এখন বাঁচব কী করে? অনেক কষ্টে রাতটা আমরা একটা বড় গাছের ডালে চেপে কাটিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে দু-একজন সঙ্গীসাথি সাপের পেটে চলে গেছে। আমি আতঙ্কে দ্বীপ ছেড়ে পালানোর কথা ভাবলাম। বিবেক সায় দিল না। সারা শরীরে কাঠের পাটাতন বেঁধে শুয়ে রইলাম। সাপে খেয়ে ফেললেও হজম করতে পারবে না। হলও তাই। একটা সাপ সারা রাত কসরত করল। লাভ হল না কিছুই।

পরদিন দ্বীপের কূলে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা জাহাজের আভাস। পাগড়ি খুলে জোরে জোরে দোলাতে লাগলাম। কাপ্তেন আমায় খেয়াল করলেন। জাহাজ এসে ভিড়ল।

ওরাই আমাকে খাওয়াল। সাজপোশাক দিল। আমার দুঃসাহসিক কাহিনী শুনে খালাসিরা খুব প্রশংসা করল আমার। কাপ্তেন বললেন,

'আমরা বেরিয়েছি বাণিজ্যে। তুমিও তো সওদাগর। ভাগ্যের ফেরে আজ নিঃস্ব। কিন্তু আমাদের কাছে আরেক হতভাগ্য সওদাগরের জিনিসপত্র রয়েছে। এগুলো বিক্রি করে লাভটা তুমি নিও। আসল দামটা আমি সেই নাবিকের আপনজনদের ফেরত দিয়ে দেব।'

মালপত্র দেখে তো আমি অবাক! এ তো আমারই সম্পদ। বাক্স পেটরায় লেখা আছে সিন্দাবাদ। দ্বিতীয় অভিযানের সময় এক জাহাজ আমাকে এক দ্বীপে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। সেই জাহাজের মালপত্রই এগুলো। কাপ্তেন বলল,

'দায়মুক্তি ঘটল আমার। এগুলো পেয়েছি আমি আরেক জাহাজ থেকে। সত্যি তুমি ভাগ্যবান।'

সওদাপাতি বিক্রি করে ভালোই লাভ হল আমার। ব্যবসা-বাণিজ্য সার্থক। হাসতে হাসতে প্রচুর বিত্ত নিয়ে দেশে ফিরে এলাম। আগামীকাল শোনাব চতুর্থ অভিযানের গল্প। কুলি সিন্দাবাদকে আজও একশো মোহর দিয়ে বিদায় করল বুড়ো নাবিক সিন্দাবাদ।

চতুর্থ অভিযানের গল্প

তৃতীয় অভিযানে প্রচুর লাভ হয়েছিল আমার । দিন কাটছিল পরম সুখে। কিন্তু ঘর ছাড়ার নেশা যার আছে সে কীভাবে স্থির থাকে? একঘেয়ে বিলাসবহুল জীবন আমার ধাতে সইল না। আবারও মাথায় চাপল বিদেশ যাবার ভূত।

এবার সঙ্গে নিলাম রংবাহারী দামি দামি জিনিশ। যা বিদেশের হাটে সহজে মেলে না। দিনক্ষণ দেখে চেপে বসলাম জাহাজে।

দিনের পর দিন যায়।

জাহাজ চলল তো চললই। আকাশের ঈশান কোণে কালো মেঘ দেখে একদিন কাপ্তেন বলল, 'ভয়ঙ্কর ঝড় উঠবে এখন। জাহাজ এগোবে না আর। এখানেই নোঙর ফেলতে হবে।'

ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গেল আমাদের। মাঝদরিয়ায় ঝড়। প্রবল ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজটা ভেঙে খানখান হয়ে গেল।

আমি একটা কাঠের টুকরো ধরে ভাসতে লাগলাম। ভাসতে ভাসতে এসে পৌঁছলাম সাগর সৈকতে। পড়ে রইলাম মরার মতো। সকালে টের পেলাম, আমার সাথিদের অনেকেই বেঁচে আছে। সমুদ্রতীরে একটা শাদা রঙের বাড়ি দেখতে পেলাম। আমাদের দেখেই একদল কালো মানুষ হৈ হৈ করে ঘিরে ধরল। কথা নেই। ইশারায় আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল ওরা। বিশাল এক সিংহাসনে বসে আছেন তাদের সম্রাট।

তিনি আমাদের বসতে বললেন। খাবার এল আমাদের জন্য। দেখতে অদ্ভুত মাংস। আমি মুখে নিতে পারলাম না। সঙ্গীরা খিদে-পেটে গোগ্রাসে তাই খেল। সাবাড় করে ফেলল সব।

আমি বুঝতে পারলাম, এই কালো লোকগুলো নরমাংসভোজী। ওরা মানুষের মাংস খায়। মানুষ ধরে এনে ওদের খাইয়ে-দাইয়ে মোটা বানায়। আদর-যত্ন করে। শরীরে চর্বি জমলে জ্যান্ত মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে কাবাব বানায়। সম্রাট এই কাবাব খেতে ভারি পছন্দ করেন।

এইসব জানার পর খিদে ভুলে গেলাম আমি। জীবন ধারণ করতে লাগলাম শুধু পানি খেয়ে। একজন পাহারাদার নিয়ে যেত বনে। গাছ থেকে ফলমূল পেড়ে খাওয়াত। আমি ছুঁয়ে দেখতাম না কিছুই। দিনে দিনে শুকিয়ে কড়িকাঠের মতো হয়ে গেলাম আমি। আমার বন্ধুরা খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে মোটা হতে লাগল। একদিন বনে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম আমি। রোগা পটকা, শুকনো বলে পাহারাদার আমাকে বড় অবহেলা করে। 'কিরে কী হয়েছে তোর? অসুখ করেছে? থাক ব্যাটা তুই পড়ে। তোকে তো খাবে শকুনেরা।'

আমাকে বনে ফেলে রেখেই পাহারাদার চলে গেল। এই রকম সুযোগের অপেক্ষাতেই আমি ছিলাম। সাত দিন সাত রাত হাঁটার পর নতুন এক দেশে এলাম আমি। সেই দেশে দেখলাম, আমারই মতো সব লোকজন। কথা হল আমারই ভাষায়।

ওরা জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? কেন তোমার এই দশা?'

আমি ওদের সবিস্তারে আমার দুঃখের কথা বললাম। শুনে ওরা বিস্মিত হল। পরম মমতায় ওদের বাড়িতে নিয়ে গেল আমাকে। পেটপুরে খাওয়াল। জাহাজ চাপিয়ে নিয়ে গেল ওদের সুলতানের দরবারে। তিনি একটা দ্বীপে চমৎকার প্রাসাদে থাকেন। শহরটাও ভারি সুন্দর। একদম বাগদাদের মতো। তাগড়াই ঘোড়া উট গাধা সবই রয়েছে এখানে। কিন্তু অবাক হলাম। —লাগাম ছাড়া, জীন ছাড়া, ঘোড়া চালায় এরা।

সুলতানকে বললাম, 'জীন-লাগাম বানিয়ে দেব আমি। শুধু আরামের নয়, দেখতেও খুব সুন্দর লাগবে তাতে।' সুলতান রাজি।

একজন ছুতোর-মিস্ত্রিকে সঙ্গে নিয়ে চমৎকার গদি বসানো কাঠের জীন বানিয়ে দিলাম। সোনার জরিতে কাজ করে দিলাম। তাগড়াই এক ঘোড়ায় লাগালাম সেই জীন আর লাগাম। ঘোড়ার যে এমন সাজ হতে পারে সুলতান তা ভাবতেই পারেননি। মহা খুশি তিনি। তখুনি লাফিয়ে উঠলেন ঘোড়ার পিঠে। আমির ওমরাহরাও শাবাশ শাবাশ করতে লাগল।

সুলতান তাঁর এক পরমা সুন্দরী কন্যার সাথে আমার বিয়ে দিলেন। কন্যা যেমন রূপসী তেমন বিদূষী। সুলতানের বড় প্রিয়পাত্র হলাম আমি। বিয়ের পর আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। বড় আনন্দে কাটতে লাগল প্রতিটি দিন। রাজপ্রাসাদে কন্যার আদর-যত্নে সুখ যেন উপচে পড়তে লাগল।

এত সুখে থেকেও মনে পড়তো দেশের কথা। বন্ধুবান্ধব-পরিজনদের কথা। ভাবতাম আবার ফিরে যাব। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। একদিন আমার প্রতিবেশীর বউ মারা গেল। সে কী কান্নাকাটি তার! আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। শোকে এত ভেঙে পড়লে চলে না। কিন্তু তার কাছ

থেকে সাংঘাতিক এক খবর শুনলাম। এদেশের বড় ভয়ঙ্কর আইন। বউ মারা গেলে বউয়ের সঙ্গে স্বামীকেও যেতে হবে কবরে। মৃত্যু একেবারে নিশ্চিত!

শরীর শিউরে উঠল আমার। এ কী রকমের প্রাণদণ্ড! ছুটে গেলাম সুলতানের কাছে। বললাম, 'আমার বউ যদি আগে মারা যায়, আমাকে কি তার সাথে মরতে হবে?'

সুলতান বললেন, নিশ্চয়ই। আইন সবার জন্যে সমান। এদেশের নিয়ম আমাকে মানতেই হবে।

কথায় আছে, কপাল যার খারাপ বিপদ তার আসবেই। হলও তাই। আমার বউ কয়েকদিনের মধ্যেই কঠিন অসুখে পড়ল। যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত্রি হয়। আমার বউ সত্যি সত্যি মারা গেল। আমার অবস্থা তখন বুঝতেই পারছ। পালাব সে পথ নেই। সুলতানের কাছে অনেক মিনতি করলাম।

সুলতান বললেন, 'শাস্ত্রের বিধান। সংসারের মায়া ত্যাগ কর। হাসিমুখে মৃত বউয়ের সঙ্গে কবরে যাও।'

আমার বউকে সাজানো হল শাদা কাপড়ে। পরানো হল দামি দামি গয়না। লাশ নিয়ে দলেবলে লোকেরা চলল পাহাড়ের ধারে। একটা গভীর কুয়োর সামনে দাঁড়ালাম। বউয়ের লাশটা নামিয়ে দেয়া হল নিচে। এবার আমার পালা। আমাকেও নিচে নামাল ওরা। তারপর পাথর-চাপা দিয়ে কুয়োর মুখ বন্ধ করে দিল। আমাকে সঙ্গে দিল সাতখানা রুটি। এক কলসি পানি। আমি কুয়োর তলায় বসে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলাম। সারাটা দিন সারাটা রাত কেটে গেল আধমরার মতো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। পরদিন ঘুম ভাঙল। পেটে প্রচণ্ড খিদে। এক টুকরো রুটি খেলাম। চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি, অসংখ্য মরা মানুষের হাড়গোড় পড়ে আছে। একদিন রুটি ফুরিয়ে যাবে। অনাহারে আমারও অবস্থা হবে ওরকম।

দেখতে দেখতে সাতদিন কেটে গেল। খাব না, খাব না করেও রুটির শেষ টুকরোটা খেয়ে ফেললাম। তারপর শুরু হল খিদের জ্বালা। একদিন এক বুড়ো এল তার বিবির মৃতদেহের সঙ্গে। ন্যায়-অন্যায় তখন বুঝি না। হাড়ের আঘাতে বুড়োটাকে হত্যা করলাম। বেশ কয়েকদিন কাটল বুড়োর রুটি আর পানি খেয়ে। মানুষের কাছে তার নিজের জীবন সবচেয়ে প্রিয়। জীবন্ত কেউ এলেই তাকে আমি হত্যা করি। কেড়ে খাই তার খাবার।

এইভাবে অনেকদিন বেঁচে রইলাম আমি। একদিন শুয়েছিলাম। হঠাৎ অদ্ভুত এক শব্দে ধড়মড় করে জেগে উঠলাম। অন্ধকারে মনে হল, কোনও প্রাণী ছুটে যাচ্ছে। হাড়ের ডাণ্ডা হাতে তার পেছনে পেছনে ছুটতে থাকি। এইভাবে অনেকক্ষণ চলার পর হঠাৎ আলোর ঝলকানি এসে পড়ল আমার মুখে। আলোর

নিশানা ধরে এবার এগিয়ে চললাম। আলো আমার আলো। আলোর বন্যায় ঝলসে গেল আমার চোখ। খুঁজে পেলাম মুক্তির পথ।

হিংস্র জন্তুরা মরামানুষ খাবার লোভে পাহাড়ের গা কেটে তৈরি করেছে এই সুড়ঙ্গ। মুক্ত হাওয়ায় প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। সমুদ্রের ধারে দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলাম অপলক। যদি কোনও জাহাজ দেখা যায়! রাত্রে ফিরে গেলাম সেই মৃত্যুকূপে। এবারে মরা মানুষের শরীর থেকে সংগ্রহ করলাম মূল্যবান হিরে-মানিক, চুনি-পান্না। শাদা কাপড়ের পুঁটলি বেঁধে নিয়ে বসে রইলাম সমুদ্র-ধারে।

দীর্ঘদিন প্রতীক্ষার পর একখানা জাহাজ দেখতে পেলাম। মাথার পাগড়ি খুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম কাপ্তেনের। ভাগ্য সহায় হল। জাহাজে চাপতেই কাপ্তেন সুধালেন, 'কে তুমি? হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের দেশে এলেই-বা কী করে? এখানে তো আজ পর্যন্ত কোনো মানুষের ছায়া দেখিনি।' আমি শোনালাম বিচিত্র অভিযানের কাহিনী। হিরা-মানিক সংগ্রহের অংশটুকু চেপে গেলাম। শুধু দামি গয়না উপহার দিলাম কাপ্তেনকে। কাপ্তেন তা গ্রহণ করলেন না। বললেন, 'তুমি নিঃস্ব। এই দুনিয়াটা হচ্ছে সরাইখানা। আজ আছি কাল নেই আমরা। যদি কারও উপকারে আসতে পারি সেটাই তো বড় কথা।'

জাহাজের খোলা পাটাতনে বসে বসে দিন কাটতে লাগল আমার। ঘন নীল পানির দিকে তাকিয়ে থাকি। আর ভাবি, কারও জীবনে কি এসব ঘটনা ঘটতে পারে? বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না এসব কথা।

'একদিন জাহাজ এসে ভিড়ল বসরার বন্দরে। বাগদাদে গিয়ে আবার আপনজনদের সঙ্গে মিলিত হলাম। সে কী আনন্দ তখন! সাত সাত চৌদ্দ দিন লোকজনদের ভুরি-ভোজন করালাম। প্রচুর টাকা-পয়সা দান করলাম গরিবদের।'

বুড়ো সিন্দাবাদ নাবিকের চোখেমুখে উজ্জ্বল আলো। বললেন,

'আগামীকাল শোনাব পঞ্চম অভিযানের কাহিনী।' কুলি সিন্দাবাদ আজও একশো সোনার মোহর পেল। তারপর চলল খাওয়া দাওয়া।

সেদিনের মতো ভঙ্গ হল আসর।

পঞ্চম অভিযানের গল্প

বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আনন্দেই দিন কাটতে লাগল আমার। ভুলে গেলাম দুঃখ-কষ্ট-মাখা দিনগুলোর কথা। মন যেন বলতে থাকে, 'আবার বাণিজ্যে যেতে হবে। সিন্দাবাদ বেরিয়ে পড়। ঘরের কোণে বন্দি হয়ে থাকা তোমার ধর্ম নয়। তোমার রক্তে ঘর ছাড়ার দুরন্ত বাসনা।'

আনকোরা নতুন জাহাজ কিনে বোঝাই করলাম মাল-সামান। মোটা মাইনেয় বহাল করলাম অভিজ্ঞ এক কাপ্তেনকে। সঙ্গে নিলাম চাকর-নফর-বান্দা। কয়েকজন বাছাই করা সওদাগর নিলাম।

বসরাহ থেকে যাত্রা শুরু হল আমাদের। চলার পথে অনেক শহর বন্দর। আমাদের দেশের জিনিশ তাদের কাছে বিক্রি করি। তাদের দেশের জিনিশ কিনে নিই। অন্য দেশে চড়া দামে বিক্রি হবে এই আশায়।

একদিন এলাম এক অজানা দ্বীপে। লোকজন নেই। শুধু বন-জঙ্গল আর ধু ধু প্রান্তর। দূর থেকে দেখা গেল গোল এক গম্বুজ। বুঝলাম এ হচ্ছে রকপাখির ডিম। সঙ্গীরা বলল, আপনি এই ডিম আগে দেখেছেন। আমরা দেখিনি। জাহাজ ভেড়ানো হোক। দেখে আসি।

জাহাজটা নোঙর করা হল।

হৈ হৈ করে ওরা ডিম দেখতে গেল। আমি জাহাজেই রইলাম। কিছুক্ষণ পর ওরা ফিরে এল ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটিয়ে। শুনে আমার হৃদপিণ্ড কাঁপতে লাগল। ডিম দুটোকে নড়ানোর চেষ্টা করেছিল ওরা। তারপর মহা উল্লাসে পাথর ছুড়ে ডিম দুটো ভেঙে ফেলেছে।

আমি বললাম, 'সর্বনাশ। রকপাখি মানুষের কোনো ক্ষতি করে না। ওদের অনিষ্ট করলে আর রক্ষা নেই। নোঙর ওঠাও। জাহাজ ছাড়ো শিগগির।'

দ্রুত জাহাজ নিয়ে চলে এলাম আমরা মাঝদরিয়ায়। ভাবলাম—বিপদ বুঝি কেটে গেছে। কিন্তু না! দূর আকাশে দেখলাম—কালো দুই খণ্ড মেঘ। হয়তো তুফান উঠবে। সে আমাদের ভুল। দুটি রকপাখি শোঁ শোঁ করে নেমে এল নিচে। পায়ে ধরা বিশাল দুটো পাথরের খণ্ড।

তারপর আর কী!

একটি পাথর চাপা পড়ে অনেকে মরল। অন্য পাথরের আঘাতে জাহাজ গেল ডুবে। কে কোথায় গেল বলতে পারব না। একখণ্ড ভাঙা জাহাজের কাঠ ধরে ভাসতে লাগলাম আমি। ঢেউয়ের তালে তালে এগিয়ে চললাম। অবশেষে এলাম এক দ্বীপের কিনারে। শরীরে শক্তি বলে কিছু নেই। মনে সাহস নিয়ে ঢুকলাম দ্বীপের ভেতরে।

দেখি এক মনোরম বাগান। রংবাহারী ফলফুল। ঝকঝকে ঝরনা। সুন্দর পাখি। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। বাগানেই বসে রইলাম। রাত নামলে ভয়ে গা ছমছম করতে লাগল। সকাল হতেই দ্বীপটা ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

চোখে পড়ল ছোট্ট একটা জলপ্রপাত। পাশে একটা সাঁকো। ওখানে রয়েছে এক বুড়ো। ভাবলাম, আমারই মতো হতভাগ্য কেউ। বুড়োর সঙ্গে আলাপ করতে চাইলাম। কিন্তু সে কোনও জবাব দিল না। চোখের ইশারায়

বোঝাল—তার চলার শক্তি নাই। কাঁধে করে ওকে বাগানের ঝরনাতলায় নিয়ে যেতে হবে।

এ আর বেশি কথা কী। অক্ষম বুড়ো মানুষের উপকার করা উচিত। বুড়োকে কাঁধের ওপর বসালাম। দুহাত দিয়ে সে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। ঝরনার পাশে এসে ওকে নামাতে চেষ্টা করলাম। বুড়ো নামবে না। বরং শক্ত করে চেপে ধরল আমার গলা। যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে আমি মরে যাব।

আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম মাটিতে। বুড়োর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা। বুড়ো লাথি মারল তলপেটে। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলাম। বুঝলাম, বুড়োর গায়ে অসুরের বল। প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমার নেই।

আমার কাঁধে চেপে সে গাছের ফলমূল খায়। ঝরনার জল খায়। দিব্যি ঘুরে বেড়ায়। রাতেও সে আমাকে চেপে ধরে শুয়ে থাকে। আমি যেন তার হাতের খেলার পুতুল। এইভাবে দিনের পর দিন লোকটার অমানুষিক অত্যাচার চলতে লাগল। আমি ভেবে পাই না, কী করে এর হাত থেকে রক্ষা পাব। একদিন ঢুকলাম আঙুর বাগানে। বুদ্ধি খেলল তখন। লাউয়ের খোসায় অনেকগুলো আঙুর পুরে মুখটা এঁটে রেখে দিলাম মাটির তলায়। বুড়ো অবশ্য ঘাড়ে বসে সবই দেখল। কয়েকদিনেই আঙুর পচে টলটলে মদ তৈরি হল। কয়েক চুমুক খেতেই দেখি বেশ চাঙ্গা লাগছে। ধেই ধেই করে নাচ শুরু করলাম আমি। ঘাড়ের ওপরের বোঝাকে আর বোঝা মনে হল না। বুড়োও সব খেল। আঙুরের রস খেয়েই আমার শক্তি বেড়েছে। তারও শক্তি দরকার। ইশারায় সে লাউয়ের খোলটা চাইল। বেশ মিষ্টি টকটকে স্বাদ। ঢকঢক করে সবটুকুই খেয়ে ফেলল। অতখানি কড়া মদ পেটে পড়ায় বুড়ো নেশায় বুঁদ হয়ে গেল। হাত-পায়ের বাঁধন আলগা হয়ে এল তার। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে আমি তাকে মাটিতে ফেলে দিলাম। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে। আমার মাথায় তখন প্রতিশোধের খুন উঠেছে। আবার কোনদিন কার সর্বনাশ করবে এই শয়তান বুড়ো, কে জানে! একখণ্ড পাথর নিয়ে ঠুকে দিলাম ওর মাথায়। লোকটা গোঙাতে লাগল। মাথাটা গুঁড়ো গুড়ো হয়ে গেছে তার।

এইভাবে শয়তানের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ভারি আনন্দ হল আমার। গান গাইতে গাইতে গেলাম সমুদ্রের তীরে। তখন সবে একখানা জাহাজ কিনারায় ভিড়ে নোঙর করেছে। নেমে এল কাপ্তেন আর মাঝি-মাল্লারা।

আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, 'এই দ্বীপে কেন নামলেন আপনারা?' তারা জানাল, 'জানি সব। তবে এখানে ঝরনার পানি বড় মিষ্টি। ফলমূল সংগ্রহ করে আবার চলে যাব। কিন্তু তুমি এখানে কেন?'

সংক্ষেপে আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী বললাম ওদের।

তারা আমাকে জাহাজে তুলে নিল। ওরাই নতুন পোশাক-আশাক দিল। হাতে পয়সা দিল। দিন চলতে লাগল ওদের দয়াতেই।

কিছুদিন চলার পর চমৎকার এক বন্দরে আমাদের জাহাজ ভিড়ল। দ্বীপটার নাম বাঁদর-শহর। এখানে শুধু নারকেল হয়। সব জায়গায় নারকেলের খুব চাহিদা। আমি আগে কখনও এই ফলটি দেখিনি। নারকেল পাড়ার কায়দাটিও বেশ মজার। থলে ভর্তি পাথরের নুড়ি ভরে নিল সবাই। দল বেঁধে গেল নারকেল বাগানের ধারে। লম্বা লম্বা গাছ। গাছের মাথায় বাঁদরের বসবাস। আমরা পাথর ছুড়ে মারতে লাগলাম। বাঁদররা গাছ থেকে নারকেল ছিঁড়ে ছুড়ে মারতে লাগল আমাদের লক্ষ্য করে। সেই নারকেল সংগ্রহ করতে লাগলাম আমরা। জাহাজ বোঝাই করলাম নারকেলে।

বন্দরে বন্দরে বিক্রি করতে লাগলাম সেগুলো। হাতে বেশ পয়সা এসে গেল আমাদের। কাপ্তেন ছিলেন বড় মানুষ এবং দুঃসাহসী।

তিনি বললেন, 'এবার যাব আমরা মুক্তো-সাগরে। ঝিনুকের খোলে মুক্তো পাওয়া যায়। ভাগ্য ভালো থাকলে মুক্তো সংগ্রহ করে প্রচুর টাকা আয় করা সম্ভব।'

আমার সৌভাগ্য। অধিকাংশ ঝিনুকেই বড় বড় মুক্তো পেলাম আমি। হাতে অনেক টাকা এসে গেল। মন চঞ্চল হয়ে উঠল তখন বাড়ির জন্যে।

জাহাজ ছেড়ে নৌকা ভাড়া করে বসরা হয়ে গিয়ে উঠলাম আমি। সেখান থেকে বাগদাদে।

নিজের দেশে। নিজের ঘরে।

'বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটতে লাগল আমার।'

ষষ্ঠ অভিযানের কাহিনী

পরদিন সকালে আবার এল কুলি সিন্দাবাদ। নাস্তাপানির পর শুরু হল ষষ্ঠ অভিযানের কাহিনী।

'একদিন গিয়েছি বন্দরে ঘুরতে। দেখি সেখানে কয়েকজন বিদেশি সওদাগর।' কথাবার্তায় বুঝলাম—বাণিজ্যে বেরিয়েছে ওরা। রক্ত চনমন করে উঠল আমার। বললাম, 'আমিও যাব। আমাকে সঙ্গে নেবেন?'

ওরা বলল, 'ভারি আনন্দের কথা।' মালপত্র বাঁধাছাদা করে জাহাজে চেপে বসলাম। নিরুদ্দেশের পথে আবার যাত্রা। নতুন নতুন নোঙর করি। সওদাপত্র ফেরি করি। কত অজানা দেশ দেখা হয়।

একদিন রাতে। কাপ্তেনের চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। অজানা অচেনা সমুদ্রে এসে পড়েছি। কী হবে কিছুই জানি না। এদিকে ঝড় উঠেছে সমুদ্রে। প্রবল ঝড়! তুফানের দাপটে উথালপাতাল করতে লাগল জাহাজখানা। ডুবোপাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে গেল সব। আমি দিশেহারার মতো পাহাড়ের এবড়ো খেবড়ো পাথর আঁকড়ে ধরে কোনওরকমে পড়ে রইলাম। মানুষজন, জিনিশপাতি কোথায় গেল কে জানে।

পাহাড়টা খাড়া উঠে গেছে। উপরে উঠার আশা দুরাশা। তবে লক্ষ করলাম, পাহাড়টা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে শুরু হয়েছে একটা দ্বীপ। অনেক কষ্টে সেই দ্বীপে পৌঁছলাম। আশ্চর্য হয়ে দেখি, সেই দ্বীপে পড়ে আছে শত শত জাহাজের ভাঙা টুকরো। পথ হারিয়ে কত জাহাজ যে চুরমার হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বাক্স-প্যাঁটরা মালপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

একটু এগোতেই চোখে পড়ল, ছোট্ট একটা নদী এগিয়ে চলেছে কুলকুল করে। নদীটা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে গিয়ে হারিয়ে গেছে। নদীটার দুই তীরে রয়েছে লক্ষ লক্ষ নুড়ি পাথর। আসলে সেগুলোর বেশির ভাগই হচ্ছে হিরা চুনি পান্না। অপূর্ব সব রত্ন। সূর্যের আলোয় সেখানে বহু বিচিত্র রঙের খেলা। এই অতুল সম্পদের অবশ্য এখানে কোনও মূল্যই নেই। মানুষ হয়তো এগুলো সংগ্রহই করতে পারবে না কোনওদিন।

প্রচুর সম্পদ এই দ্বীপে। কিন্তু কোনও খাদ্যদ্রব্য নেই। খিদের জ্বালায় হন্যে হয়ে ঘুরলাম। খিদের যে কী কষ্ট তা কীভাবে বোঝাই। নিজের ওপর রাগ হল। কেন আবার বাণিজ্যে বেরিয়েছিলাম। কী দরকার ছিল? এখন জনশূন্য এই দ্বীপে না খেয়ে মরতে হবে আমাকে। কেউ মনেও রাখবে না আমার কথা।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল, আচ্ছা এই যে ছোট্ট নদী—এর উৎস কোথায়? মৃত্যু যখন অবধারিত তখন নদীর জলে ভেসেই রওনা দেয়া যাক। কয়েক বস্তা মণি-মাণিক্য সংগ্রহ করে কাঠের ভেলায় রওনা দিলাম। ভেলাটা এক সময় ঢুকে গেল সুড়ঙ্গের মধ্যে। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। পথ যেন আর ফুরোয় না। সময়-অসময় জ্ঞান লুপ্ত হল আমার। সবার মতো চলেছি তো চলেছি।

হঠাৎ একদিন জ্ঞান ফিরল আমার। টের পেলাম, ঘাসের জমিতে শুয়ে আছি আমি। আমার চারপাশে অনেকগুলো উৎসুক মুখ। কেউ কারও কথা বুঝি না। কিন্তু ওদের চেহারায় রয়েছে সমবেদনার ছাপ। আমি ইশারায় বোঝালাম পেটে প্রচণ্ড খিদে। ওরা খাবার আনতে ছুটল। খেয়েদেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিলাম আমি। একজনকে দেখে মনে হল, সে হয়তো আমার ভাষা বুঝবে।

তাকে সব বৃত্তান্ত খুলে বললাম। সে দোভাষীর মতো অন্যদের বুঝিয়ে দিল। শুনে সবাই তাজ্জব। এমন দুঃসাহসিক কাণ্ড কেউ করতে পারে!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এ জায়গাটার নাম কী?'

দোভাষী বলল, 'সারণ দ্বীপ। চল তোমাকে নিয়ে যাই সম্রাটের কাছে।'

সাদর অভ্যর্থনা পেলাম সম্রাটের কাছে। অতি ভালো মানুষ তিনি। তাঁকে কয়েকটা মূল্যবান পাথর উপহার দিলাম আমি। খুব খুশি তিনি। আমার অভিযানের কাহিনী বললাম, তাঁকে।

প্রকাণ্ড বড় দেশ এই সারণ দ্বীপ। এর উত্তরে রয়েছে বড় পাহাড়ের চূড়া। লোকে বলে, ওখানে নাকি পাওয়া যাবে পৃথিবীর অমূল্য রত্নরাজি।

সম্রাট বাগদাদ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। বাগদাদের শাসনব্যবস্থা কেমন? সুলতান হারুন-আল-রশিদই-বা কতটা জনপ্রিয় শাসক?

আমি তাঁকে জানালাম হারুন-আল-রশিদের মতো সুশাসক অন্য কোথাও আছে কি-না জানা নেই। প্রজারা তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।

বড় খুশি হলেন সারণ দ্বীপের সুলতান। বাগদাদের খালিফার জন্যে উপহার পাঠাতে চাইলেন তিনি। জাহাজ সাজানো হল। মূল্যবান রত্নপাথর দিলেন। সাপের চামড়ার গালিচা দিলেন। হাতির দাঁতের নকশা-করা বহুবিচিত্র জিনিস দিলেন।

স্বদেশকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। সারণের সুলতান আমাকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। বিষণ্ণ মনে আমি জাহাজে গিয়ে উঠলাম। সুলতান বললেন, 'তোমার জন্যে আমার দরজা সবসময় খোলা রইল।'

নিরাপদেই আমি ফিরে এলাম বসরায়। সেখান থেকেই গেলাম খলিফা হারুন-আল-রশিদের কাছে। সুলতানের উপহার আর চিঠি দিলাম।

আমার অভিযান কাহিনী শুনেও খলিফা মুগ্ধ হলেন। খলিফা অসম্ভব আদর যত্ন করলেন আমাকে। বললেন, 'আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু। তোমার দুঃসাহসের জয় হোক।'

খলিফা অনেক মূল্যবান উপহার দিলেন আমাকে। সারণ দ্বীপের সুলতানের জন্যে জাহাজ আনলেন উপহারসামগ্রী পাঠানোর লক্ষ্যে। আমি ন্যায়পরায়ণ, মহানুভব খলিফার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললাম নিজ দেশে।

এই হচ্ছে আমার ষষ্ঠ অভিযান। সমুদ্রযাত্রার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।'

সপ্তম অভিযানের গল্প

পরদিন খানাপিনার আসর বসল জাঁকজমকের সঙ্গে। যেন এক উৎসব। সময়মতো কুলি সিন্দাবাদ এসে হাজির। আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। তারপর কাহিনী বলতে শুরু করেন বৃদ্ধ নাবিক সিন্দাবাদ।

'ততদিনে আমার বয়স হয়েছে। প্রতিটি অভিযানেই সঞ্চয় করেছি তিক্ত অভিজ্ঞতা। মরণফাঁদ থেকে উদ্ধার পেয়ে বেঁচে এসেছি বারবার। সমুদ্র অভিযানের

সংকল্প মন থেকে মুছে ফেললাম একেবারে। আমি এখন বাগদাদের সেরা ধনী। আমার খ্যাতিও এখন যথেষ্ট। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই যথেষ্ট নয়।'

খলিফা হারুন-আল-রশিদ একদিন ডেকে পাঠালেন। বললেন,

'সিন্দাবাদ, সারণ দ্বীপের সুলতানের কাছে শুভেচ্ছা আর কিছু উপহার পাঠাব। তুমি আমার দূত হয়ে তার কাছে যাও।'

খলিফার ইচ্ছাই আদেশ। এ ছাড়া আমারও কিছুটা আগ্রহ ছিল। খলিফা শ্রেষ্ঠ উপহারসামগ্রী দিলেন। মখমলের বিছানা, হাজারও সাজপোশাক, রেশমি কাপড়, সোনার ফুলদানি আরও কত কিছু।

জাহাজ ভাসল সাগরে।

চলল একটানা দুই মাস। এলাম সারণ দ্বীপে। সুলতান দারুণ খুশি হলেন আমাকে পেয়ে। সুলতান বললেন, 'যতদিন খুশি তুমি থেকে যাও।' আদর-যত্নের কোনও অভাব রইল না। রাজার মতো সম্মান পেলাম, কিন্তু আমি খলিফার দূত হয়ে এসেছি। সময়মতো আমাকে ফিরে যেতে হবে।

বিদায় নিয়ে চললাম বসরার দিকে। লাগল হাওয়া। খুব সুন্দর সমুদ্রযাত্রা আমাদের। এক সপ্তাহ পরে সিন দ্বীপে এসে নোঙ্গর করলাম। এখানে ভালো ব্যবসা-বাণিজ্য হল।

সিন ছাড়িয়ে সবে সমুদ্রের মাঝ বরাবর এসেছি এমন সময় পথের নিশানা হারিয়ে ফেলল কাপ্তেন। দ্রুত সে উঠে গেল মাস্তুলে। খবর ভালো নয়। আমরা এসে পড়েছি মরণফাঁদ এক দ্বীপের মুখোমুখি। এমন সময় উঠল ঘূর্ণিঝড়। কাছেই ছিল ছোট একটা দ্বীপ। কিন্তু বড় ভয়ানক সে জায়গা। পাহাড়ের মতো বড় বড় অজগর সাপ আছে সেখানে। সাপের পেটে না গিয়ে জলে ডুবে মরাই ভালো।

কাপ্তেন চোখ বড় বড় করে শাদা গুঁড়ো বের করে নাকে পুরে নিল। তারপর একটা বই বের করে জাদুমন্ত্র আওড়াতে লাগল। কাপ্তেন বলল, 'সামনের দ্বীপে আছে সুলমানের সমাধি। আজ পর্যন্ত কেউ ওখানে যেতে পারেনি। এখানে এলেই তেড়ে আসতে থাকে তুফান। দ্বীপে রয়েছে বিষধর সাপ আর বিরাট বিরাট দানব।'

দেখতে দেখতে ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে গেলাম। প্রচণ্ড ধাক্কায় টলে উঠল জাহাজটা। ঢেউ এসে আছড়ে পড়তে লাগল পাটাতনে। কে কোথায় বাঁচল না মরল, সে কথা মনে নেই। আমি যথারীতি ভাঙা কাঠের টুকরো আঁকড়ে ভাসতে লাগলাম। এলাম সুন্দর একটা দ্বীপের কিনারায়। শান্ত শ্যামল ফলে-ফুলে ভরা। এখানেও দ্বীপের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে ঝিরঝিরে এক নদী। ফলমূল খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিলাম। নদীর জলে ভাসিয়ে দিলাম ভেলা। এ-রকম নদীই আমায় একবার বাঁচিয়েছিল। নদীর ধারে রয়েছে এক ধরনের গাছ। সুগন্ধে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

ভেলার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে নিলাম এই গাছের ডালপালা। স্রোতের টানে ভেসে চলেছে ভেলা। অজ্ঞানের মতো পড়ে রইলাম। জ্ঞান যখন ফিরল, প্রাণপণে উঠে বসবার চেষ্টা করলাম। কারা যেন আমার হাত-পা বেঁধে রেখেছে। কানে এল, কিছু লোকের চিৎকার। ওরা একদল জেলে। জাল ফেলে আমাকে তীরে তুলল।

শীতে আমি তখন ঠকঠক করে কাঁপছি। ওরা আমাকে কাপড়-চোপড়ে ঢেকে দিল। একজন বুড়ো পরম মমতায় তেলমালিশ করে সুস্থ করে তোলেন আমাকে। বুড়ো নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন আমাকে। চমৎকার সব খাবার এনে দিলেন।

বুড়োকে বললাম আমার সমুদ্র অভিযানের বিচিত্র সব কাহিনী। বুড়ো মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনল সব। জানাল, 'তোমার সঙ্গে যে মূল্যবান মালপত্র রয়েছে সেগুলো বাজারে নিয়ে এখুনি বিক্রি করে দাও।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'মালপত্র কোথায় আমার?' বুড়ো বলল, 'তুমি যে গাছের ডালগুলো সঙ্গে এনেছ সেগুলো মূল্যবান চন্দন কাঠ। দুষ্প্রাপ্য এবং দামি।'

বুড়ো বাজারে গিয়ে চন্দন কাঠগুলো নিলামে তুলে দাম ঠিক করলেন। এবং নিজেই কিনতে চাইলেন। আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, 'আপনি চাইলে আমি এমনিতেই এইসব দিতাম। লজ্জা দিলেন আপনি।' পরদিন বুড়ো তার মনের কথা খুলে বললেন আমাকে। বুড়োর রয়েছে অগাধ সম্পত্তি আর পরমাসুন্দরী এক মেয়ে। রূপে-গুণে অনন্যা। অনেকেই এই মেয়েকে বিয়ে করতে চায় শুধু সম্পত্তির লোভে।

বুড়ো বললেন, 'তোমার মতো সৎ নিষ্ঠাবান ও সাহসী লোকই আমি খুঁজছিলাম। তুমিই পারবে আমার মেয়েকে সুখী করতে। আর আমিও শান্তিতে মরতে পারব।'

এই বৃদ্ধ আমার জীবন বাঁচিয়েছে। তিনি যা বলবেন তা না করে কী করি। বুড়োর একটাই অনুরোধ, যে কটা দিন তিনি বেঁচে থাকবেন, মেয়েটাকে নিয়ে তার কাছে থাকতে হবে। বুড়ো মারা গেলে বিষয়-সম্পত্তি বেচে দেশে ফিরে গেলেও কোনও আপত্তি নেই।

আমি রাজি হলাম। মহা ধুমধামে বিয়ে হল আমাদের। সেই বউকে নিয়েই এখনও আমাদের সুখের সংসার। বউকে নিয়ে ভালোভাবেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল আমার। একদিন আমার শ্বশুর ইন্তেকাল করলেন। শোকে ভেঙে পড়ল সারা দেশের লোক। যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁকে সমাহিত করা হল।

শ্বশুরের ব্যবসাপাতি দেখাশোনা শুরু করলাম। দিনে দিনে ওদের দেশেরই একজন হয়ে গেলাম।

প্রতি বছর এখানে বসন্তকালে বিশাল এক উৎসব হয়। উৎসবে এরা নানা রকম খেলাধুলা করে। পিঠে ডানা বেঁধে এরা আকাশে ওড়ার চেষ্টা করে। সে

বছর আমারও সাধ হল এই খেলায় অংশগ্রহণ করব। আমাকে ওরা ভালোবাসে বলে বারবার মানা করল। কিন্তু কোনও দুঃসাহসিক কাজেই আমার আগ্রহ বেশি।

নীল আকাশে ডানা মেলে উড়ে চলেছি আমরা। মনের আনন্দে গান গাইছি। হঠাৎ দমকা হাওয়ায়-ওলোট-পালোট হয়ে গেল সব। ডানা ভেঙে পড়লাম এক পাথরের টিলায়। আল্লাহ আমার সহায়। দেখি সামনে দাঁড়িয়ে দুজন বালক। বলল, আমরা জাদুকর। তারাই আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিল।

এদিকে আমার বউ আশা ছেড়ে দিয়ে কেঁদে কেঁদে অস্থির। আমাকে ফিরতে দেখে আনন্দে আত্মহারা। বউ বলল, 'এই হতচ্ছাড়া দেশে আর থাকব না। চল, বাগদাদে তোমার দেশেই ফিরে যাই আমরা। সয়সম্পত্তি সব বেচে দাও।'

ভালো দামে অগাধ সম্পত্তি বিক্রি করে জাহাজে চেপে একদিন ঠিক ঠিক বাগদাদে পৌঁছে গেলাম।

ইতিমধ্যে দীর্ঘদিন প্রবাসে কেটেছে আমার। ভালোবাসার মানুষেরা ধরেই নিয়েছে আমার ফিরে আসার আর কোনও আশা নেই। আমাকে পেয়ে তারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। দারুণ আদর-যত্নে আত্মীয়-স্বজনেরা আমার ভিনদেশি বিবিকে ঘরে তুলল।

এই হচ্ছে আমার শেষ অভিযান।

বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্য গুছিয়ে নিয়ে আমি এখন বাগদাদের সেরা ধনী। সেরা সুখী মানুষ। তারপর দেশ ছেড়ে আর কোথাও যাইনি। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসের মতো পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। এখন বয়স হয়েছে। মন চাইলেও শরীর কুলোবে না। বিগত দিনের কাহিনীগুলো এখন স্বপ্নের মতোই মনে হয়।

সুখে শান্তিতেই আমার দিন কেটে যাচ্ছে।

'অনেক বন্ধু-বান্ধব রয়েছে আমার। ভালো কিছু বন্ধু পাওয়া জীবনের পরম সৌভাগ্য।'

বলে গল্প শেষ করলেন বুড়ো নাবিক সিন্দাবাদ। কুলি সিন্দাবাদকে বললেন, 'যখন ইচ্ছে হয় তখনই তুমি বাড়ি আসবে। আমার বাড়িকে তোমার নিজের বাড়ি মনে করবে।'

কুলি সিন্দাবাদ বলল, 'মালিক আমি ভুল বুঝতে পেরেছি। মানুষ জীবনে উন্নতি করে অনেক পরিশ্রম করে। চেষ্টা করে অর্জন করতে হয় সম্পদ।'

সেদিন থেকে দুই সিন্দাবাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। গরিব কুলি সিন্দাবাদ দুঃখে কাতর হয়নি আর কখনও। বন্ধুর কাছে গেলেই তিনি সব দুঃখ ভুলে যেতেন।

এই হচ্ছে সিন্দাবাদের সাত অভিযানের দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর লোমহর্ষক গল্প।

আলিবাবা

এক ছিল বুড়ো গরিব চাষি। তার দুই ছেলে—কাসিম আর আলিবাবা। চাষি মরে গেলে তার সামান্য সম্পত্তির সমান ভাগ পেল দুই ভাই। এই সামান্য সম্পত্তি নিয়ে ছেলেরা নিজেদের ভাগ্যের উন্নতি করতে পারল না একটুও; তারা আরও গরিব, একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ল।

দুই ভাইয়ের স্বভাব ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। কাসেম খুব লোভী, বড় কুটিল তার মন। অন্যদিকে আলিবাবার মন ফুলের মতো সুন্দর, সৎপথে থেকে কাজ করে বেঁচে থাকতে চায় সে। দুই ভাইয়ের যখন খুব কষ্টে দিন কাটছিল তখন হঠাৎ এক বড়লোক সওদাগরের সুনজরে পড়ে গেল কাসিম। সওদাগরের সব বাণিজ্যের কাজে কাসিম হল বিশ্বাসী আর যোগ্য কর্মচারী। সওদাগর এক সময় বুড়ো হয়ে কাজকর্মের শক্তি হারিয়ে ফেলল। তখন নিজের এক মেয়ের সঙ্গে কাসিমের বিয়ে দিল। সেই সঙ্গে তার সম্পত্তির দেখাশোনার ভারও পেল কাসিম। কাসিম হঠাৎ ধনী হয়ে উঠল।

আলিবাবা বনে গিয়ে কাঠ কেটে আনে। সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করে। এতে যা টাকা পায় তা দিয়ে কোনওরকমে খেয়ে-না-খেয়ে দিন কাটে। আলিবাবার স্বভাব ছিল মধুর। সবার সঙ্গে ছিল তার ভালো সম্পর্ক। প্রয়োজন ছাড়া টাকা-পয়সা খরচ করত না সে। জাঁকজমক করে দিন কাটত না তার; যা আয় করত তার মধ্য থেকে কিছু-না-কিছু পয়সা জমাত প্রতিদিন। এভাবে পয়সা জমিয়ে তিনটি গাধা কিনল আলিবাবা। সেই গাধার পিঠে করে বন থেকে কাঠ কেটে আনত সে।

অন্য এক কাঠুরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হল আলিবাবার। তার ধন-সম্পদ নেই; তবু বউ নিয়ে তার দিন কাটতে লাগল সুখে-শান্তিতে।

একদিন।

আলিবাবা প্রতিদিনের মতো গাধা তিনটিকে নিয়ে বনে গেল কাঠ কাটতে। বনে গিয়ে গাধাগুলোকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিল। তারপর আরেকটু গভীর বনের দিকে এগোল কাঠের খোঁজে। হঠাৎ দূর থেকে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ এল! একি দস্যুদলের ঘোড়ার খুরের শব্দ! নাকি রাজার সৈন্যদল এগিয়ে আসছে এদিকে? বিপদের গন্ধ পেল আলিবাবা। তাড়াতাড়ি একটা ঝুপড়ি গাছে উঠে, পাতার আড়ালে লুকিয়ে রইল। ভাবল দেখা যাক, কী ঘটে!

একটু পরে ঠিক সেই গাছের নিচে এসে থামল একদল ঘোড়সওয়ার। লোকগুলো একেকটা যেন দেখতে ভয়ঙ্কর দৈত্যের মতো। এটা বড় কোনও দস্যুদল না হয়েই যায় না! গাছের ডালে বসে ভয়ে কাঁপতে লাগল আলিবাবা। এমন ভয়ংকর মানুষ কখনও দেখেনি সে।

প্রত্যেকের ঘোড়ার পিঠেই অনেক মালপত্র। আলিবাবা যে গাছটার উপর লুকিয়ে আছে সেটা পেরিয়ে একটু সামনে গিয়ে গাছটার একেবারে গোড়ায় এসে থামল ওরা। চল্লিশ জনের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দেখতে যে লোকটা সে চেঁচিয়ে উঠল জোরে, 'চিচিং ফাঁক।'

আর অমনি পাহাড়ের গোড়ার মাটি গেল দুভাগ হয়ে। পাহাড়ের মধ্যিখানের একটা অংশে দেখা দিল ফাটল! মনে হল পাহাড়ের দুটি দেয়াল দুদিকে সরে গেল! একে একে সবাই তাদের মালপত্তর আর ঘোড়াসহ ঢুকে পড়ল সেই ফাটলের মধ্যে। তারপর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দেখতে লোকটা বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'চিচিং বন্‌ধ।'

অমনি দুপাশ থেকে পাহাড়ের দেয়াল এগিয়ে এসে বুজিয়ে দিল ফাটলটা। কারও বোঝারই উপায় রইল না যে এই পাহাড়ের ভেতরে লুকিয়ে আছে চল্লিশজন দস্যু। এর ভেতরে জমানো রয়েছে অনেক অ-নে-ক ধনসম্পদ, মণি-মাণিক্য! আলিবাবা তো ভয়ে একেবারে চুপ। সেই গাছের আড়ালেই বসে রইল অনেকক্ষণ! কে জানে কখন আবার হঠাৎ পাহাড় ভেঙে সেই দস্যুদল বেরিয়ে আসবে! তাকে ওরা দেখতে পেলে মৃত্যু নিশ্চিত। যা ভয়ঙ্কর এই দস্যুরা!

দুপুর গড়িয়ে বিকেলও যায় যায়। আলিবাবা গাছের উপর পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে তো বসেই আছে। হঠাৎ আবার শোনা গেল সেই শব্দ—

'চিচিং ফাঁক।'

অমনি সেই আগের মতো পাহাড়ের মধ্যিখানের অংশটা দু ভাগ হয়ে গেল। একে একে বেরিয়ে এল সেই চল্লিশজন ভয়ঙ্কর দস্যু। নিশ্চয় আবার কোথাও থেকে ডাকাতি করে ধনসম্পদ লুঠ করে আনতে যাচ্ছে। দস্যুসর্দার পাহাড়ের ফাটলের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'চিচিং বন্‌ধ।'

আবার সেই একই কাণ্ড। আলিবাবা ভাবল বেশ মজা তো। 'চিচিং ফাঁক' বললেই দরজা খুলে যায় আর 'চিচিং বন্ধ' বললেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়!

দস্যুদল ধীরে ধীরে অনেক দূরে চলে গেল। তাদের ঘোড়ার খুরের শব্দও শোনা যায় না। আলিবাবা নেমে এল গাছ থেকে। গাধাগুলোকে ঘাস খেতে যেখানে ছেড়ে দিয়েছিল সেখানে এসে দেখল মনের আনন্দে ঘাস খাচ্ছে ওরা! গাধাগুলোকে নিয়ে আবার ফিরে এল দস্যুদলের সেই ফাটলের সামনে। আলিবাবা সেই দস্যুসর্দারের মতো চেঁচিয়ে বলল, 'চিচিং ফাঁক।'

অমনি দু'ভাগ হল পাহাড়ের দেয়াল। আলিবাবা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ফাটলের মধ্যে। মাথা ঘুরে গেল তার। এত মোহর! এত সোনা! রূপা-হিরে-জহরত!!! জীবনে কখনও দেখেনি সে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ধাতস্থ হয়ে নিল আলিবাবা। তারপর ভাবল, এ নিশ্চয়ই আল্লাহর আশীর্বাদ। নইলে গরিব আলিবাবা এত হিরে-জহরত-মণি-মাণিক্যের সন্ধান পেল কী করে। জীবনে কখনও অসৎ পথে চলেনি, অন্যের ক্ষতি করেনি বলে আল্লাহ খুশি হয়ে তাকে এই পুরস্কার দিয়েছেন।

এত হিরে-জহরত-মণি-মাণিক্য দেখেও আলিবাবা বেশি লোভ করল না। তিনটি গাধায় করে যতগুলো সোনার মোহর নিয়ে যাওয়া সম্ভব শুধু ততটুকু মোহর নিল। তারপর আলিবাবা ফিরে চলল বাড়ির উদ্দেশ্যে। হিরে-জহরত আর অন্য ধন-সম্পদ যেখানে যা ছিল সেভাবেই রয়ে গেল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে আলিবাবা ভাবল, এই ধনসম্পদ এখানে জমাতে গিয়ে কত-না মানুষ খুন করেছে এই দস্যুরা। কত মানুষের চোখের পানি ঝরেছে কে জানে। যারা মানুষ মেরে এত ধনসম্পদ জমায় তারা শেষপর্যন্ত তা ভোগ করতে পারে না। কারণ এসব রক্ষা করতে করতেই শেষ হয়ে যায় তাদের জীবন। আল্লাহই তাদের নির্মম শাস্তি দেন। আল্লাহর উদ্দেশ্যে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাল আলিবাবা।

তিন গাধার পিঠে বস্তা ভর্তি করে কী এনেছে দেখতে গিয়ে চোখ দুটো গোল হয়ে গেল আলিবাবার বউয়ের। সরল সাধারণ গরিব কাঠুরের বউ সে। এত সোনার মোহর জীবনে দেখেনি। সে ভাবল, আলিবাবা এই মোহর কীভাবে পেল? দস্যুদলে নাম লেখায়নি তো? নাকি সে কোনও রাজার ভাণ্ডার থেকে চুরি করে এনেছে? বিলাপ করে কান্না জুড়ে দিল সে। অনেক কষ্টে আলিবাবা বুঝিয়ে শুনিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারল তাকে। তারপর খুলে বলল সবকিছু।

আলিবাবা আর তার বউ পড়ে গেল মহা সমস্যায়। এত মোহর তারা রাখবে কোথায়! কত মোহর আছে তাদের সেটাই-বা বুঝবে কী করে! অনেক ভেবে ঠিক করল ঘরের মেঝেয় গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে রাখবে সব। কিন্তু তার আগে তো জানা

চাই কত মোহর আছে! গুণতে বসে তালগোল পাকিয়ে যায় বারবার। শেষে আলিবাবা ঠিক করল, পাল্লায় ওজন মেপে তারপর গর্তে ভরে রাখবে। আলিবাবার বউ ছুটল কাসিমের বাড়িতে।

কাসিমের বউ ভীষণ চালাক! দুষ্ট বুদ্ধিতে গিজগিজ করে তার মাথা। আলিবাবার বউ এসে দাঁড়িপাল্লা ধার চাইলে জিজ্ঞেস করল পাল্লা দিয়ে ওরা কী মাপবে? আলিবাবার বউ বলল,

'আমার স্বামী বাজার থেকে একবস্তা চাল এনেছে। সেই চাল মাপার জন্যই দাঁড়িপাল্লা দরকার।'

কাসিমের বউয়ের মনের সন্দেহ কিন্তু গেল না। ভাবল, আলিবাবা হঠাৎ এত বড়লোক হল কী করে? একবারে একবস্তা চাল এনেছে বাজার থেকে! দাঁড়িপাল্লা সে ধার দিল ঠিকই। কিন্তু পাল্লার নিচে একটু আঠাও লাগিয়ে দিল। দেখা যাক কী মাপে আলিবাবার বউ। চাল না অন্য কিছু!

সরল, বোকা আলিবাবার বউ এসবের কিছুই বুঝতে পারল না। পাল্লা নিয়ে বাড়ি এল। মোহর মেপে গর্তে ভরে রাখল। তারপর ফিরিয়ে দিয়ে এল পাল্লা। কাসিমের বউ অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল আলিবাবার বউ কী মাপে সেটা জানার জন্য। পাল্লাটা উল্টিয়েই কাসিমের বউ অবাক! বুঝতে পারল কোনওভাবে অনেক মোহরের মালিক হয়েছে। সেই মোহরের পরিমাণ এতই বেশি যে মাপতে দাঁড়িপাল্লার দরকার পড়ে গেছে!

কাসিম বাড়ি ফিরতেই বউ তাকে সব ঘটনা জানাল। কাসিমকে ঠেলেঠুলে বাধ্য করল আলিবাবার বাড়ি যেতে। কাসিমের মনেও জেগে উঠল লোভ। তক্ষুনি ছুটল সে। আলিবাবা তখন সবেমাত্র সোনার মোহরগুলো মাটিতে পুঁতে রেখে কোদাল পরিষ্কার করছিল। আলিবাবাকে দেখে হম্বিতম্বি শুরু করল কাসিম।

'কোথায় পেলি তুই এত মোহর?'

'কে বলেছে আমি মোহর পেয়েছি?'

'কে আবার বলবে। এই মোহর আমাদের পাল্লায় এল কোত্থেকে। নিশ্চয়ই তোর কাছে অনেক মোহর আছে। নইলে দাঁড়িপাল্লা দিয়ে তোরা মোহর মাপলি কেন? চুরি ডাকাতি করেছিস নাকি তুই! আমাদের বংশের নাম ডুবল তোর জন্য।'

বকুনি শুনে মন খারাপ হয়ে গেল আলিবাবার। বাধ্য হয়ে সবকিছু খুলে বলল কাসিমকে। মোহরগুলো ভাগ করে অর্ধেক তাকেও দিতে চাইল। কিন্তু লোভী কাসিম এই ভাগে তুষ্ট নয়। 'কে নিতে চায় তোর এই সামান্য কটা মোহর। তুই বরং আমাকে ঐ জায়গাটা চিনিয়ে দে। আমি নিজেই গিয়ে মোহর নিয়ে আসব। খবরদার! আমাকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করবি না।'

পাহাড়ের কাছে কীভাবে পৌঁছতে হবে তা তো বললই, সেই সঙ্গে ঐ পাহাড়ের দরজা খোলার আর বন্ধ করার মন্ত্রটাও বলে দিল কাসিমকে।

লোভী কাসিম তো মহাখুশি। বাড়িতে এসে বউকে সব বলল। পরদিনই ওই ধনসম্পদ আনতে যাবে সেখানে। খুশিতে তাকে অনেক কিছু রেঁধে খাওয়াল কাসিমের বউ। সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য পুঁটুলি বেঁধেও দিল কিছু। লোভী কাসিম ছুটল ধন-সম্পদ আনতে। তার আনন্দ দেখে কে!

আলিবাবার কথামতো ঠিক ঠিক মিলে গেল সবকিছু। সব যে ঠিক থাকবে তা জানত কাসিম। কারণ আর যাই হোক আলিবাবা যে মিথ্যেবাদী নয় তা সকলেই জানে। পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল কাসিম, 'চিচিং ফাঁক'।

অমনি খুলে গেল দরজা। ভেতর দিয়ে আবার চেঁচাল কাসিম, 'চিচিং বন্ধ।'

বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

এ কী দেখছে কাসিম! রাশি রাশি সোনার মোহর! হিরে-মণি-মাণিক্য!! এত সম্পদ জীবনে কখনও দেখেনি। আর এখন সে এত কিছুর মালিক! সবকিছু ভোগ করবে কাসিম আর তার বউ! আলিবাবাকেও দেবে না। খুশিতে গুহার মধ্যে ডিগবাজি খেল কয়েকবার। সোনার মোহর আর দামি দামি হিরে-মণি-মুক্তাগুলোকে জড়িয়ে ধরে কী যে করবে ভেবে পেল না।

এভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর সুস্থির হল কাসিম। সঙ্গে করে অনেকগুলো বস্তা এনেছিল সে। যত পারল বস্তার মধ্যে পুরতে লাগল সবকিছু। কাসিম এনেছিল ছয়টি খচ্চর। কিন্তু এত মালপত্র নিল যে এগুলো পনেরটা খচ্চরও বহন করতে পারবে না। বস্তার মুখ ভালো করে বেঁধেছেদে বাইরে বেরুবার জন্য তৈরি হল কাসিম।

কিন্তু এ কী! কিছুতেই দরজা খোলার মন্ত্র মনে আসছে না যে। এখন কী করবে? মন্ত্র মনে রাখার জন্য কী যেন ভেবেছিল? মনে পড়েছে। সে ভেবে রেখেছিল মানুষ খিদে পেলে যা করে তা মনে এলেই দরজা খোলার মন্ত্রটা মনে আসবে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠল,

'খাই খাই ফাঁক।'

খুলল না দরজা। এখন কী হবে? দরজা খুলছে না কেন? কেঁদে উঠল কাসিম। আবার ভাবতে চেষ্টা করল খিদে পেলে মানুষ কী করে! খিদে পেলে মানুষ মজার তরকারি আর রুটির কথা ভাবে। চেঁচিয়ে উঠল কাসিম,

'রুটি আর দুম্বার মাংসের তরকারি ফাঁক!'

কই, তবুও তো খুলছে না দরজা।

আলু ফাঁক। বেগুন ফাঁক। খেজুর ফাঁক। কত কিছু ফাঁক যে বলল কাসিম। বলে শেষ করা যাবে না। তবু খুলল না দরজা। কী করে এখান থেকে বেরুবে

কাসিম? কোনও বুদ্ধি এল না মাথায়। ভয়ে, ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়ল সে। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল ক্লান্ত হয়ে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল এভাবে।

ফিরে এল চল্লিশজন দস্যু। তারা দেখল গুহার সামনে কয়েকটা গাধা চরে বেড়াচ্ছে। সরদার ভাবল, এখানে বা আশেপাশে কেউ আছে! সব্বনাশ! কে আমাদের এই গোপন আস্তানার সন্ধান জানতে পারল! হুঙ্কার দিয়ে উঠল সর্দার। তার দলের লোকদের বলল,

'সাবধান। কে যেন আছে আশেপাশে। সামনে পাওয়া মাত্র তার ঘাড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে ফেলবি।'

সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে খুঁজতে লেগে গেল দস্যুরা। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও পাওয়া গেল না কাউকেই। তারপর সর্দার 'চিচিং ফাঁক' বলতেই খুলে গেল পাহাড়ের দরজা। কাসিম ভয়ে, খিদেয় আর ক্লান্তিতে কাবু হয়ে সেই যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে ঘুম তখনও ভাঙেনি। ভেতরে ঢুকে সবকিছু লণ্ডভণ্ড দেখে সর্দারের বুঝতে অসুবিধা হল না যে শত্রু ভেতরেই আছে। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হল শত্রুটাকে দেখামাত্র যেন তার ঘাড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে ফেলা হয়। হুকুম হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দু-টুকরো হয়ে গেল ঘুমন্ত কাসিম। তারপর সর্দারের হুকুমে তাকে ছয়-টুকরো করে বস্তাবন্দি করে রেখে দিল দস্যুরা।

এদিকে কাসিমের বউ অপেক্ষা করে বসে আছে কখন অনেক অ-নে-ক ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরবে কাসিম। ছয় খচ্চরের পিঠ-ভর্তি ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরবে সে। আরও বড়লোক হয়ে যাবে তারা। সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে। সকলে তাদের কথা শুনবে। রাজার হালে কাটবে তাদের দিনকাল।

কিন্তু কোথায় কাসিম? সে তো ফিরছে না। সেই ভোরে ছয়টা খচ্চর নিয়ে বেরিয়েছে সে। বিকেলবেলাই ফিরে আসবার কথা।

বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা হল। কই কাসিম? কাসিম কেন ফেরে না! কত মোহর আনছে সে? ভাবল বউ। যতই সময় পেরুতে লাগল ততোই চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল মন। কেমন যেন ভয় এসে ছেঁকে ধরল তাকে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত গভীর হল। ফেরার নাম নেই কাসিমের। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আলিবাবার বাড়ি ছুটল কাসিমের বউ। গিয়েই কান্নাকাটি শুরু করে দিল,

'ভাই আলি, তোমার ভাই কাসিম তো এখনও এল না। আমার কী হবে! বাঘ সিংহে খেয়ে ফেলেনি তো তাকে?'

আলিবাবা সান্ত্বনা দিল তার ভাইয়ের বউকে। বোঝানোর চেষ্টা করল,

'আমার ভাই অনেক বুদ্ধিমান আর শক্তিশালী, সে যাবে বাঘ সিংহের পেটে? তা কি হয় কখনও! অনেক ধন-সম্পদ বোঝাই করে আনছে তো! তাই সময়

লাগছে। হয়তো মালের ভারে ধীরে ধীরে হাঁটছে খচ্চরগুলো। তুমি কিচ্ছু চিন্তা কোরো না ভাবি। ঠিক চলে আসবে ভাইজান।'

আলিবাবার কথায় কাসিমের বউ শান্ত হল কিছুটা। কিন্তু মনের ভয় দূর হল না একটুও। এখন সে নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগল। তার জন্যেই তো কাসিম ধন-সম্পদের জন্য লোভ করেছে। দূরে, অচেনা পাহাড়ে-জঙ্গলে গিয়েছে। সে যদি আলিবাবার মোহরের খবর জানার জন্য ব্যস্ত না হতো, মোহরের খোঁজ পেয়ে কাসিমকে ঠেলে না পাঠাত তাহলে তো আর কাসিম নিখোঁজ হতো না। নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল কাসিমের বউয়ের। কেন সে বেশি সম্পদের লোভ করেছিল!

সেই রাত্রিও পার হল। কাসিমের দেখা নেই। কাসিমের বউয়ের প্রায় উন্মাদ হবার দশা। আলিবাবা ভোরবেলা ছুটল ভাই কাসিমের সন্ধানে। এসে পৌঁছল সেই জায়গায় যেখান থেকে সে মোহরগুলো নিয়েছিল। এসেই যা দেখল তাতে তার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। ছয়টা খচ্চর রক্তাক্ত অবস্থায় মরে পড়ে আছে। খচ্চরগুলোর অবস্থা দেখে আলিবাবা বুঝতে পারল তার ভাই কাসিমের অবস্থা কী হয়েছে। ভয়ে ভয়ে পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তেই উচ্চারণ করল, 'চিচিং ফাঁক'।

পাহাড়ের দেয়াল দু'ভাগ হয়ে গেল আগের মতোই। আলিবাবা দেখল একটা বস্তা পড়ে আছে। বস্তার মুখ খুলতেই দেখতে পেল কাসিমের টুকরো-টুকরো দেহ। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আলিবাবা তাড়াতাড়ি বস্তার মুখ বেঁধে বাড়ি ফিরে চলল। দরজায় দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে আলিবাবার বাঁদি মর্জিনা। আলিবাবা ভাবল, ভালোই হয়েছে ওকেই ব্যাপারটা আগে খুলে বলতে হবে। মেয়েটা বেশ বুদ্ধিমতি। অনেক সময়ই মর্জিনার বুদ্ধি কাজে লেগেছে আলিবাবার। আলিবাবা আর মর্জিনা ধরাধরি করে কাসিমের লাশের বস্তা ঘরে ঢুকিয়ে রাখল।

সব শুনে মর্জিনা এক বুদ্ধি বের করল মনে মনে। কাসিমের এ অবস্থার কথা অন্যদের জানাবার আগেই লাশটাকে জোড়া লাগাতে হবে। না-হয় ফাঁস হয়ে যাবে সবকিছু। রাজার ফৌজি বাহিনী এসে সবকিছু ওলট-পালট করে দেবে। কিন্তু কী করে যেন কাসিমের বউ আলিবাবার ফেরার খবর টের পেয়ে গেছে। আলিবাবা একা ফিরেছে দেখে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল কাসিমের বউ। তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরল মর্জিনা। কোনওরকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করল। তারপর সব ঘটনা খুলে বলল, লাশটা যতক্ষণ জোড়া লাগানো না-যাচ্ছে ততক্ষণ এ ব্যাপারে টুঁ শব্দটি করা যাবে না।

তারপর। মর্জিনার মনে পড়ল বাজারের বুড়ো মুচি বাবা মুস্তাফার কথা। এই বুড়ো মুচি কিছুদিন আগে তার একটা জুতো এত সুন্দর করে সেলাই করে

দিয়েছিল যে সেলাইয়ের দাগ বোঝাই যায়নি। ওকে দিয়ে আগে লাশটা সেলাই করতে হবে। তারপর ব্যবস্থা করতে হবে দাফনের।

যেই ভাবা সেই কাজ। মর্জিনা বাজারের বুড়ো মুচি বাবা মুস্তাফার দোকানে গিয়ে হাজির। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে বাবা মুস্তাফাকে তাদের বাড়ি নিয়ে এল সে। তার আগে বুড়ো বাবা মুস্তাফার চোখ বেঁধে নিতে ভুল করেনি মর্জিনা। বাড়িতে নিয়ে আসার আগে ফুসলিয়ে কসম খাইয়ে নিয়েছে তাকে। বলেছে কোনও অবস্থাতেই এই লাশ জোড়া লাগাবার কথা যেন অন্য কাউকে না বলে। মুখ ফসকে এই লাশ জোড়া লাগাবার কথা কাউকে বলে ফেললেও যেন বাড়িটা চিনতে না পারে সেজন্য বুড়োর এই চোখ বাঁধার ব্যবস্থা।

মর্জিনার অনুমানই ঠিক। বুড়ো বাবা মুস্তাফা নিপুণভাবে লাশটাকে সেলাই করে দিল। বোঝার কোনও উপায় রইল না যে এটা একটা ছয়-টুকরো করে কাটা মানুষের লাশ। মর্জিনার বুদ্ধিমতো পাড়া-প্রতিবেশীকে জানিয়ে দিল তিন দিনের জ্বরে ভুগে কাসিম হঠাৎ মারা গেছে। কাসিমের বউও প্রাণের ভয়ে এই ব্যবস্থা মেনে নিল।

এদিকে দস্যুরা পরদিন আস্তানায় ফিরে দেখল বস্তাবন্দি কাসিমের লাশটা নেই। নিশ্চয়ই কেউ তাদের এই গোপন আস্তানার খবর জেনে গেছে। যে করেই হোক তাকে খুঁজে বের করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে দুনিয়া থেকে। চল্লিশ দস্যুর প্রত্যেকেই শপথ নিল। তাদের আস্তানার খবর যে জানে তাকে খুঁজতে একজন একজন করে বেরুবে তারা। যে সেই লোকটিকে খুঁজে আনতে না-পারবে তার শাস্তি মৃত্যু!

প্রথম দস্যু গেল শহরে। ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে হাজির হল বাবা মুস্তাফার দোকানে। এ-কথা সে-কথা বলে বাবা মুস্তাফার সঙ্গে খাতির জমিয়ে ফেলল দস্যুটা। কথায় কথায় বাবা মুস্তাফা জানাল, সে নিখুঁতভাবে চামড়া সেলাই করতে পারে। সেলাইয়ের দাগ দেখা যায় না। এমনভাবে মরা মানুষ পর্যন্ত সেলাই করতে পারে সে। কান খাড়া হয়ে গেল দস্যুটার। জিজ্ঞাসা করল,

'কী সাহেব, মরা মানুষ টানুষ কি দুচারটা জোড়া দিয়ে দেখেছেন নাকি? না কি খামোখা বড়াই করছেন?'

'আপনি কি ভাবছেন আমি এমনি এমনি কথা বলছি? এই তো সেদিন ছয় টুকরো একটা মানুষকে দিব্যি নিখুঁতভাবে সেলাই করে দিলাম। সেলাইয়ে একটা ফোঁড়ও দেখা যায়নি।' বেশ জোর দিয়ে বলল মুচি বাবা মুস্তাফা।

ছদ্মবেশী দস্যুটা এমনভাবে কথা বলল যেন সে কিছুই বোঝে না। হাবার মতো জিজ্ঞাসা করল,

'তোমাদের দেশে এ কীরকম নিয়ম? কেউ মরে গেলে তাকে ছ টুকরো করে কাটতে হয়? আবার সেলাই করে জোড়া দিয়ে তারপর তাকে কবর দিতে হয়?'

মুচি হাসল,

'তা হবে কেন, কারা যেন লোকটাকে মেরে ছয় টুকরো করে ফেলেছিল। তাই আমাকে দিয়ে সেলাই করিয়ে তারপর কবর দিয়েছে। কাজটার জন্য অনেক ইনাম পেয়েছিলাম।'

ছদ্মবেশী দস্যুটা বলল,

'কেমন করে এমনটা হল তা জানার জন্যে আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে। তুমি ভাই আমাকে সে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে?'

'তা পারব কেমন করে? আমার চোখ বেঁধে তারপর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে!' ছদ্মবেশী দস্যু তখন মুচি বাবা মুস্তাফার চোখে রুমাল বেঁধে বলল,

'তুমি এখন আমার হাত ধরে মনে করে করে এগোও। কখন কোথায় থেমেছ, কখন ডানে-বাঁয়ে মোড় নিয়েছ সেটা আন্দাজ করে করে আমাকে সেই বাড়িতে নিয়ে চল।'

বুড়ো মুচি সেভাবেই তাকে নিয়ে যেতে থাকল। হঠাৎ থেমে সামনের দিকে দেখিয়ে বলল, 'এই এই, সেই বাড়ি।' ছদ্মবেশী দস্যুটা আলিবাবার বাড়ির দরজায় চক দিয়ে একটা কাটা চিহ্ন এঁকে দিল। বাবা মুস্তাফাকে খুশি করে দিল ইনাম দিয়ে।

আস্তানায় ফিরে সর্দার আর সঙ্গীদের সব কিছু বিস্তারিতভাবে জানাল।

একটা কাজে বাইরে গিয়েছিল মর্জিনা। ফিরে এসে দেখল মনিবের বাড়ির দরজায় একটা কাটা চিহ্ন আঁকা। খটকা লাগল মনে। বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেখল একটা চক পড়ে আছে সামনে। কী যেন মনে করে চকটা দিয়ে আশপাশের সবগুলো বাড়িতেই কাটা চিহ্ন এঁকে রাখল সে।

পরদিন দস্যুদল এসে আর আলিবাবার বাড়ি চিনতে পারল না। ফিরে গিয়ে ছদ্মবেশী দস্যুটাকে কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলল সর্দার।

এরপর আরও দুজন বেরুল আলিবাবার খোঁজে। প্রত্যেকেই একইভাবে বাবা মুস্তাফার মাধ্যমে বাড়ি চিনে দরজায় চিহ্ন দিয়ে এসেছিল। কিন্তু দলবলসহ ফিরে এসে অন্য বাড়িগুলো থেকে আলিবাবার বাড়িটাকে আলাদা করতে পারল না কেউই। প্রাণ গেল সে দুজনেরও।

শেষমেষ দস্যু সর্দার নিজেই গেল আলিবাবার সন্ধানে। সে-ও ঘুরতে ঘুরতে এল বাবা মুস্তাফার কাছে। তার থেকে খোঁজ নিয়ে আলিবাবার বাড়িতে এসে হাজির। দস্যু সর্দার এবার আলিবাবার বাড়ির দরজায় একটা মোহরের চিহ্ন এঁকে

www.alorpathsala.org

রাখল; সেইসঙ্গে চারপাশের গাছপালা দেখে অনেকগুলো চিহ্ন এঁকে নিল মনে মনে। কোনওরকম ভুল হবে না এবার।

দস্যু সর্দার অন্য উপায় বের করল।

সে তার দলের লোকগুলোর একেকজনকে একেকটি করে মটকার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। আর একটা মটকা ভর্তি করে রাখল তেল দিয়ে। অন্য মটকাগুলোর মুখের দিকটাতেও মাখিয়ে রাখল তেল। দেখলে মনে হবে সবগুলো মটকার মুখে ঝাঁকুনি লেগে তেল ছলকে ছলকে পড়েছে। সওদাগরের ছদ্মবেশ ধরল দস্যু সর্দার। তার সঙ্গে সাঁইত্রিশটা মটকা। রাতে আলিবাবার বাড়িতে এসে আশ্রয় চাইল। আলিবাবা তো খুব ভালো মনের মানুষ। কেউ তার কাছে কোনওরকম সাহায্য চাইলে তাকে উপেক্ষা করতে পারে না। সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করে। সওদাগরের অনুরোধও রাখল সে।

সওদাগরের ছদ্মবেশে-আসা দস্যু সর্দার আলিবাবার বাড়িতে মেহমান। আলিবাবা মর্জিনাকে বলল ভালো ভালো খাবার রান্না করতে। যেন অতিথি তার বাড়িতে খাওয়ার কথা সারা জীবন মনে রাখেন। খাওয়া-দাওয়া শেষে সবাই ঘুমোতে যাবে। মর্জিনা আলিবাবাকে জানাল, তার প্রদীপের তেল ফুরিয়ে গিয়েছে। আলিবাবা বলল,

'এত রাতে তুই তেলের কথা বললি? এখন তো কোনও দোকান খোলা পাব না। তুই এক কাজ কর। আমাদের অতিথির তেলের মটকা থেকেই প্রদীপের জন্য তেল নিয়ে আয়। এইটুকু তেল নিলে কী আর মনে করবেন তিনি।'

মর্জিনা গেল মটকা থেকে তেল নিতে। একটা মটকার ঢাকনা যেই সরিয়েছে অমনি ভেতর থেকে কে যেন ফিসফিস করে বলল,

'সর্দার সময় হতে দেরি কত?'

চমকে উঠল মর্জিনা। এক মুহূর্ত ভাবল সে। ফিসফিস করে বলল,

'না, সময় হয়নি।'

একে একে প্রত্যেকটা মটকার ঢাকনা সরিয়ে দেখল মর্জিনা। শুধু শেষের মটকাতে তেলভর্তি। অন্য সবগুলোতেই মানুষ কথা বলেছে। সওদাগর তার মনিবকে মারতে এসেছে! বুদ্ধিমতি মর্জিনার এ-কথা বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না। সওদাগরের ছদ্মবেশে আসা লোকটা আসলে দস্যু সর্দার। মর্জিনার মাথায় বুদ্ধি এল একটা। যে মটকায় তেল ভরা আছে তা থেকে তেল ঢেলে নিল একটা পাতিলে। সেই তেল চুলোর আগুনে টগবগ করে ফুটিয়ে নিল। তারপর একে একে ঢেলে দিল প্রত্যেকটা মটকায়। মটকার ঢাকনা দিল বন্ধ করে। এইভাবে ছত্রিশজন দস্যু গেল খতম হয়ে।

মর্জিনা রান্নাঘরে আলো নিভিয়ে ভেতরবাড়ির ফটকে খিল লাগাল। তারপর শুয়ে পড়ল নিশ্চিন্ত মনে। রাত আরও গভীর হল। সর্দার মনে করল এতক্ষণে বাড়ির সবাই নিশ্চয়ই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মটকাগুলো লক্ষ্য করে একটা-একটা করে ঢিল ছুড়ল সর্দার। আগেই কথা ছিল মটকার গায়ে ঢিল পড়ামাত্র সবাই তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু ছত্রিশ দস্যুর একজনও বের হল না। ক্ষেপে গিয়ে সর্দার নিজেই মটকাগুলোর কাছে গেল তাদের বকুনি দেয়ার জন্য। সর্দার ভেবেছিল সবাই তাদের কাজের কথা ভুলে ঘুমিয়ে পড়েছে। একে একে সব মটকার ঢাকনা খুলল সে। দেখল সবাই মরে কাঠ হয়ে আছে। শেষ মটকায় একটুও তেল নেই! সর্দারের বুঝতে বাকি রইল না বাড়ির লোকজন তার পরিচয় জেনে গেছে। সর্বনাশ ঘটে গেছে অনেক আগেই। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে দস্যু সর্দার বাইরের ফটক খুলে একেবারে পগার পার।

মর্জিনা সর্দারের অবস্থা দেখে হাসল মনে মনে। বুঝল আপাতত আর কোনও বিপদ নেই। রাতে তাই আলিবাবাকে কিছুই জানাল না।

ঘুম ভাঙার পর অতিথির খবর নেয়ার জন্য বাইরের ঘরের দিকে পা বাড়াল আলিবাবা। তার আগেই ঘুম থেকে উঠে কাজে লেগে গেছে মর্জিনা। মর্জিনা তখন তাকে মটকাগুলোর কাছে নিয়ে এল।

'আব্বাজান, আপনি নিজেই দেখুন কাকে আদর-আপ্যায়ন করে ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আর একটু হলেই তো সব শেষ হয়ে গিয়েছিল।' আলিবাবা তো অবস্থা দেখে থ। মর্জিনাকে অনেক আদর করল। বলল,

'তুই আমার মা। তোর বুদ্ধিতে দুইবার বিপদ থেকে বেঁচে গেছি।'

বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা।

আলিবাবার বড়ভাই কাসিমের দোকান দেখাশোনা করে আলিবাবার ছেলে। সেই ছেলে তার বাবা আলিবাবাকে একদিন বলল,

'বাবা, আমি যখন প্রথম প্রথম দোকানে বসতাম তখন ব্যবসার অনেক কিছুই বুঝতাম না। আমার পাশের দোকানের হুসেন সাহেব আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন, বুঝিয়েছেন। একদিন তাঁকে আমাদের বাড়িতে দাওয়াত করে খাওয়াতে চাই। এমন একজন উপকারী মানুষকে সম্মান দেখানো উচিত।'

'বেশ তো। তুইতো ভালো কথাই বলেছিস। যা তাঁকে দাওয়াত করে আয়।' আলিবাবা বলল।

পরদিন মেহমান দাওয়াত খেতে আসবেন। আলিবাবার ছেলে এসে মর্জিনাকে জানাল মেহমান তরকারিতে লবণ দেয়া পছন্দ করেন না। তাঁর জন্য রান্না করা তরকারিতে যেন লবণ দেয়া না হয়।

খটকা লাগল মর্জিনার মনে। রান্নাবান্না সে করল মনোযোগ দিয়েই। তরকারিতে লবণও দেয়নি। কিন্তু মন থেকে তার খটকা যায়নি। মেহমান এলে পর খাবার সাজানো হল। খেতে খেতে বারবার সুস্বাদু খাবারের প্রশংসা করতে লাগলেন মেহমান।

খাওয়া-দাওয়া শেষ। মর্জিনা আর আলিবাবার ভাই কাসিমের ক্রীতদাস আবদুল্লা মিলে একটা নাচ দেখাবার আয়োজন করল। একটা ধারাল ছুরি হাতে নিয়ে মর্জিনা আর আবদুল্লা নাচতে শুরু করল। নাচতে নাচতে এমন ভাব করল যে ছুরি নিয়ে সে একবার নিজের বুকে বসিয়ে দিতে যায়, একবার আলিবাবার বুকে বসিয়ে দিতে যায়, কিন্তু কারও বুকেই সে ছুরি বসায় না। নাচ দেখে খুব মজা পাচ্ছেন মেহমান।

হঠাৎ নাচতে নাচতে এগিয়ে এসে মর্জিনা মেহমানের হৃৎপিণ্ডের উপর প্রচণ্ড জোরে বসিয়ে দিল ছুরিটা। ঢলে পড়ল মেহমান। আলিবাবা আর তার ছেলে হায় হায় করে উঠল।

'এ কী করলি তুই মর্জিনা! আমাদের মেহমানকে খুন করলি তুই!'

মর্জিনা তখন মেহমানের কোমরে-বাঁধা কাপড়টা সরিয়ে দিল। সবাই দেখল তার কোমরে একটা ধারাল ছুরি। নকল দাড়িতে ধরে টান দিতেই খুলে এল দাড়ি। আলিবাবা বুঝতে পারল এই ছদ্মবেশী আসলে দস্যু সর্দার।

আলিবাবা বুঝতে পারল মর্জিনার বুদ্ধিই এবারও তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আলিবাবা ভীষণ খুশি হল। মর্জিনাকে একেবারে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে চিরকালের জন্য স্নেহের বন্ধনে বেঁধে রাখল।

পাহাড়ের গুহার সব সম্পত্তি এনে গরিব-দুঃখী মানুষের জন্যে খরচ করল আলিবাবা।

তারপর।

সব মানুষের ভালোবাসা নিয়ে সুখে শান্তিতে দিন কাটতে লাগল তার।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
অনুমোদিত
অনুমতি নং
বইটিকে যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করুন

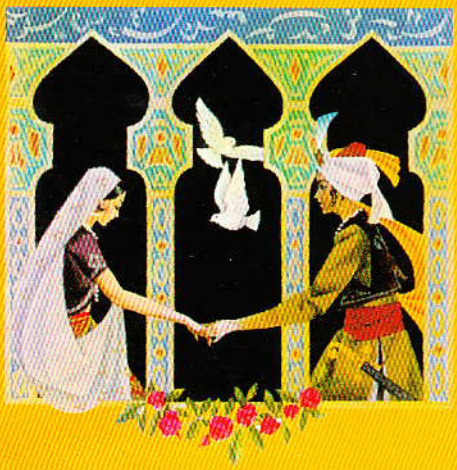

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত গ্রন্থমালা'**র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র